মার্চ ২০১৬

মাসিক

কিশোরস্বপন

সাহিত্যের পথে গৌরবের অতীতে

- কেমন আছো হে লাল-সবুজের প্রিয় স্বাধীনতা!
- সোনার হরফে লেখা
- পুরনো কালের ছবি

মাকতাবাতুদ দাওয়াহ

১। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (র), শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামাহা (দা), শাইখ সাইয়েদ বাকদাশ (দা), শাইখ আলী তনতবী (র), প্রমুখ আলেম গনের অধিকাংশ কিতাবের বৈরুতের মূল কপি।

২। দুইশতাধিক বিষয়ে ছোট ছোট আরবী রিসালাহ বিশেষ ছাড়ে এখন মাত্র ১০ (দশ) টাকা করে।

৩। দেশী বিদেশী দরসী গায়রেদরসী কিতাবের অনন্য ঠিকানা।

৪। বিশ্ব ইজতেমা ময়দান হতে হেটে বা রিক্সায় সহজেই মাকতাবায় আসা যায়।

বাসা-০৫, রোড-১১/এ, সেক্টর-১১ উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪৫-৮৯৯৩৪৭, ০১৭৫৫-৫৬৯৯৬৪

maktabatul islam

মাকতাবাতুল ইসলাম

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : ৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা ১২১২।
ফোন : ০১৯১১ ৬২০৪৪৭, ০১৯১১ ৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র : ১১/১ ইসলামি টাওয়ার [২য়তলা], বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০। ফোন : ০১৯১২ ৩৯৫৩৫১, ০১৯১১ ৪২৫৮৮৬

যাত্রাবাড়ি বিক্রয়কেন্দ্র : ৩১২ কিতাব মার্কেট, [দোকান নং ২৬-২৭], দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ১২০৪
ফোন : ০১৯১১ ৬২০৪৪৭, ০১৯১২ ৩৯৫৩৫১, ০১৯১৪ ৪৬১৩৯৪

www.facebook.com/maktabatulbd www.maktabatulislam.net

মাকতাবাতুল আযহার

পাঠক ও বইপ্রেমীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি ঢাকার তিন প্রান্তে। আপনি আপনার কাছের শাখা থেকে সংগ্রহ করুন আপনার পছন্দের আরবি, উরদু ও বাংলা বই। এছাড়াও মধ্যবাড্ডার মূল বিক্রয়কেন্দ্রে পৃথক একটি বাংলা বিভাগ আপনাদের সেবায় প্রস্তুত।

হানাফীদের নামায সম্পর্কে সকল অপপ্রচারের জবাবে এ বইটিই যথেষ্ট

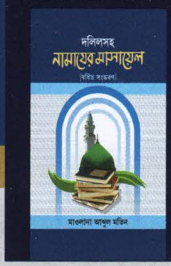

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
9881532 01924076365

বাংলাবাজার শাখা
১ আন্ডার গ্রাউন্ড ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা 01715023118

যাত্রাবাড়ি শাখা
৩৪, ৩৫, ৩৬ কিতাব মার্কেট
কুতুবখালি, ঢাকা 01975023118

বরেণ্য গদ্যশিল্পী মাওলানা যাইনুল আবিদীনের সমকালীন বিচিত্র বিষয়ের ওপর আরো ৯টি বই আমরা প্রকাশ করেছি।

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদের ইতিহাস-আশ্রিত গল্পের সমাহার নিয়ে আমাদের প্রকাশিত ছ'টি বই আপনার গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

পাঠকনন্দিত লেখক মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীর তিনটি অসামান্য বইয়ে আপনি পাবেন আপনার আত্মার খোরাক।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তকী উসমানীর অর্থনীতি বিষয়ক অনবদ্য সিরিজ ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। দাম : ১০০০ টাকা মাত্র।

শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর বয়ানসমগ্র ২০ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ড পৃথক কেনা যাবে। সিরিজটির মূল্য : ২২৪০ টাকা মাত্র।

বাংলাদেশে আমাদেরই রয়েছে সর্ববৃহৎ আরবি প্রকাশনা। এছাড়াও মিসর, বৈরুত ও পাকিস্তানের আরবি উরদূ কিতাবের সবচেয়ে বড় সম্ভার থেকে আপনার পসন্দের বইটি কিনতে চলে আসুন আমাদের মূল বিক্রয়কেন্দ্রে।

মাকতাবাহ কামেলা

একটি পিডিএফ বুক সংকলন

প্রায় ১২০০ জিবি থেকে বাছাইকৃত ২৪৫ জিবির বিশাল দুর্লভ এক ইলমী সংগ্রহ–

বাংলার ৫৬৭ টি কিতাব ৭.৫ জিবি
উরদুর ৩৫৯৫ টি কিতাব ১১৬ জিবি
আরবী ৭০০০ টি কিতাব ১২২ জিবি

বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ি শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দাম ১,০০০ টাকা মাত্র। ৩০০ জিবির হার্ডডিস্ক বা ল্যাপটপ নিয়ে আসতে হবে।

১৬ হাজার কিতাবের মাকতাবায়ে শামেলার ৩য় ভার্সন, আরবী কথপোকথনের আল আরাবিয়্যাতু বাইনা ইয়াদাইক। ৪০০ টাকায় এন্ড্রোয়েড মোবাইলের জন্যে শামেলা ভার্সন।

সংখ্যা ৪ ■ বর্ষ ১

মাসিক কিশোর স্বপ্ন

সাহিত্যের পথে গৌরবের অতীতে

পৃষ্ঠপোষক
ইফতিখার হাবিব বেগ

উপদেষ্টা
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ

সম্পাদক
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

নির্বাহী সম্পাদক
জিয়াউল আশরাফ

সহযোগী সম্পাদক
আবদুল্লাহ সিদ্দীক

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন
মাহমুদ মুজিব

বিদেশ প্রতিনিধি
মীর সাখাওয়াত হোসাইন ■ যুক্তরাষ্ট্র
হোসাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক ■ কাতার
যোবায়ের হোসাইন ■ মিসর
আবদুল্লাহ আল মাজেদ ■ সৌদি আরব
রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ■ যুক্তরাজ্য

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাজী যুবাইর মাহমুদ

সার্কুলেশন সহকারী
মুবাশশির মামুন

যোগাযোগ
মাসিক কিশোর স্বপ্ন
বাড়ি ১/৭, রোড এন.এস
[বাইতুল আতিক জামে মসজিদ রোড]
ব্লক এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা ১২১৯
০১৮৭৫ ৪৯৪৯৯৭, ০১৯৭৫ ৪৯৪৯৯৭
kishorshopno@gmail.com

দাম : ২৫ টাকা

সূচি

সম্পাদকীয়	০৩
কুরআনের উপদেশ	০৪
প্রধান রচনা	০৫
নির্বাচিত ছড়া	০৮
কিশোর কবিতা	০৯
কিশোর গল্প	১০
স্মৃতিচারণ	১২
হতে চাই তাদের মত	১৫
একঝলক শিশুবেলা	২০
বিশেষ রচনা	৩৫
সাহাবি গল্প	৩৮
ছড়া	৪০
কিশোর উদ্যান	৪১
চিঠিপত্র	৪৪
ছোটদের ইসলাম	৪৫

জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন

অনুপ্রাস এর ইসলামী সঙ্গীত

আপডেট থাকুন অনুপ্রাসের সাথে
onuprashshilpigosthi
onuprash

হটলাইন
০১৮২২৮৬৫০৪৪
০১৯২০৭৯৬০৪৬

হতে পারে আপনার রিংব্যাক টোন

সঙ্গীত সেট করার নিয়ম

গ্রামীণফোন
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন Wt স্পেস দিয়ে গানের কোড লিখে পাঠিয়ে দিন 4000 নাম্বারে

রবি
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন get স্পেস দিয়ে গানের কোড লিখে পাঠিয়ে দিন 8466 নাম্বারে

এয়ারটেল
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন CT স্পেস দিয়ে গানের কোড লিখে পাঠিয়ে দিন 3123 নাম্বারে

টেলিটক
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন TT স্পেস দিয়ে গানের কোড লিখে পাঠিয়ে দিন 5000 নাম্বারে

বাংলালিংক
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন DOWN স্পেস দিয়ে গানের কোড লিখে পাঠিয়ে দিন 2222 নাম্বারে

রিংব্যাক টোন ব্যবহারে মাসিক চার্জ + ভ্যাট প্রযোজ্য। একটি টোন ব্যবহারে যা চার্জ কাটা হবে একাধিক টোনে একই মাসিক চার্জ প্রযোজ্য

টাইটেল	শিল্পী	গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য কোড: গ্রামীণফোন, রবি, এয়ারটেল ও টেলিটক	বাংলালিংক
ইয়া রাহীম আল্লাহু	কোরাস	4687166	59822
ইয়া নাবী	কোরাস	4687165	59821
ভালো লাগে	কোরাস	4687164	59820
সবুজ শ্যামল এই দেশ	কোরাস	4687163	59819
সোনা চাঁদি চাইনা আমি	কোরাস	4687162	59817
রাহমানুর রাহীম	কোরাস	4687160	59816
পার করেনে তুই আমারে	শামীম আহমাদ	4687159	59815
অনুপ্রাস থিম সং	কোরাস	4687158	59814
ঐ দোয়েল বল	কোরাস	4687157	59813
ও প্রিয়তম তুমি	কোরাস	4687156	59812
ও আকাশের চাঁদ	কোরাস	4687155	59811
নিঝুম রাত	ইমতিয়াজ রাসেল	4687154	59810
মৌমাছি নাচি নাচি	কোরাস	4687153	5989
মরনেরি ডাকে	কোরাস	4687152	5988
মোরা সুরের পাখি	কোরাস	4687151	5987
মনটা যদি	ইমতিয়াজ রাসেল	4687150	5986
যতদিন পৃথিবীতে	কোরাস	4687149	5985
বৃষ্টির রিনিঝিনি	কোরাস	4687148	5984
আজ আমায় কেউ ডাকেনা	ইমতিয়াজ রাসেল	4687147	5983
আমরা ছোট	কোরাস	4687146	5982
আমার কণ্ঠে যদি	ইমতিয়াজ রাসেল	4687145	5981

অনুপ্রাসের সকল শাখায় ভর্তি চলছে

সুস্থ্যধারার অনলাইন রেডিও চ্যানেল শুনতে ভিজিট করুন
RadioTouch24.com
শান্তির পথে তারুণ্য
www.radiotouch24.com
www.fb.com/radiotouch24
radiotouch24@gmail.com

Concept

সুস্থ্য বিনোদনের সকল খোজ-খবর ও গান পেতে ভিজিট করুন
দেশাল বিডি .com
/deshalweb
www.deshalbd.com

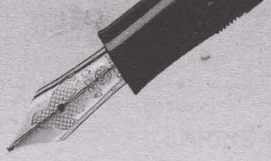

মার্চ এসেছে। স্বাধীনতার মাস। ২৬ শে মার্চ। ত্যাগে মোড়ানো। রক্তে রাঙানো। বীরত্বগাথায় ভাস্বর। স্বাধীনতার ঘোষণায় দীপ্তিময়। স্বাধীনতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সে তাৎপর্য ও গুরুত্বের গভীরে প্রবেশ করে এ কলামকে কঠিন করে তুলতে চাই না। তারচে বরং চলো প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ-এর একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি। একটু খোঁজ নিই প্রিয় বাংলাদেশ-এর সবুজ মানচিত্রের। একটু ঘুরে বেড়াই এর সবুজ প্রকৃতির কোলে কোলে। তারপর শেষে স্বাধীনতার কাছেই জানতে চাই একটু : কেমন আছো প্রিয় স্বাধীনতা!
তবে রক্তনদী পেরিয়ে অর্জিত এ স্বাধীনতাকে কেউ আঘাত করতে চাইলে আমরা কিন্তু বসে থাকবো না! আবার হবে যুদ্ধ—মুক্তিযুদ্ধ। আবার গর্জে উঠবে বাংলাদেশের দামালরা অস্ত্র হাতে।

এক.
বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকার দেশ। ছবির মতো সুন্দর। এঁকেবেঁকে বয়ে-চলা নদীর মতো সুন্দর মানচিত্র। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। ভারি সুন্দর এ মাথা থেকে ও মাথা। সবুজে সবুজে ছাওয়া। শ্যামলিমায় ঢাকা। মাঝে মাঝে মেঘের কোলে রোদে ভাসা। সাঁঝ-আকাশের ছায়ার নিচে ভীষণ মনোলোভা। নদ-নদী আর পাহাড়-পর্বতে কিংবা বন-বনানী আর শাপলা-শালুকে যেনো অদ্বিতীয়া। ছোট-বড় সবুজ টিলা কিংবা উঁচু-নিচু পাহাড় ঘেরা বীর চট্টলা— নয় কি প্রকৃতির অপরূপ দয়া? চা বাগান আর কমলার সিলেট যেনো কুদরতের আরেক কারিশমা! বান্দরবন আর পার্বত্যের সেই-যে সবুজ-অঞ্চল— যেনো চিরসবুজ জান্নাতের 'একটু ছায়া'! দেখেছো কি কখনো— 'দুই চক্ষু মেলিয়া'?

দুই.
একটু ঘুরে বেড়াও! চোখ ফেরাও! এই পুকুর। এই খাল। শরৎ-হেমন্তের কিংবা শীত-বসন্তের পালাবদলে কী সুন্দর করে প্রকৃতিও তার রূপ বদলায়। অপরূপ রূপময়তায় হেসে-হেসে ওঠে। এ হাসি আরো বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যখন নদী-খাল-বিল-পুকুরে 'দামাল' শিশু-কিশোররা নাইতে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি আর দাপাদাপিতে মেতে ওঠে! এদিকে মুক্ত অবারিত গ্রামবাংলায় দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ময়দানে ক্ষেতে রাখালের ছুটে চলা সেই স্নিগ্ধ সকালে আবার 'নীড়ে' ফিরে আসা ওই গোধূলীবেলায়— কী যে দৃষ্টিকাড়া! ক্ষেতের পরে ক্ষেত চলেছে। সবুজে সবুজে ভেসে। তাকিয়ে থাকলে মনে হবে— কে বিছালো অনিঃশেষ এই সবুজ গালিচা? বসন্তের আগমনে কেনো বাংলার কোকিলকণ্ঠে এতো মধু ঝরে? কেনো বাগানে বাগানে এতো ফুল .. এতো ফল .. এতো গান বিচিত্র সব পাখ-পাখালির?! অমন অপরূপ সাজে কে সাজালো আমাদের এই প্রকৃতি? আরো বলো, এই-যে বিলের ধারে অথবা শেওলা জলের ওই সবুজাভ পুকুরটাতে কিংবা বর্ষার ওই হাঁটুজলে পাটচাষীদের 'নাওয়া-খাওয়াহীন' ব্যস্ততার মাঝে— কী চিত্রটি ফুটে ওঠে?! কোথায় পাবে বলো অমন সোনা সোনা দৃশ্যপটের অপূর্ব সব চিত্রকলা?! আরো কতো চিত্র আছে আমাদের এই বাংলাদেশ-এর বাঁকে বাঁকে, সব বলে কি শেষ করা যায় ছোট্ট এই পরিসরে?

তিন.
ফিরে আসি স্বাধীনতার কথায়। অমন সুন্দর দেশের স্বাধীনতা এনেছে যারা— রক্ত লাগলে রক্ত দিয়ে, জীবন লাগলে জীবন দিয়ে, এমন বীরদের কেমনে ভুলবে? বলবে কি একটু বুকটা ধরে?
তবে স্বাধীনতার ছায়ায় বসে, স্বাধীনতার মায়ায় গড়ে করছে যারা বজ্জাতি গাদ্দারি বেঈমানি, শাসক হলে করছে শোষণ— পৌঁছে গিয়ে জুলুমবাজির শেষ সীমানায়! কালো টাকা করছে রুজি দু'হাত মেলে অন্ধকারে, কেউ-বা আছে আদালতের ছায়ায় বসে করছে শুধু দুর্নীতি! টাকা পেলেই বদলে যাচ্ছে সত্য থেকে মিথ্যাবাদী! বলো তো ওদের আছে কি কোনো ক্ষমা? নয় কি ওরা অযোগ্য? যত্তোসব অপদার্থ? কেনো করছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তের সাথে ওরা বেঈমানি?
জানিনে, এ সবের ভেতর কেমন আছো তুমি প্রিয় স্বাধীনতা! বলো তো; এ সব থাকলে মনে কি আর সুখ আসবে এই সবুজ ছায়ায় তাকিয়ে তাকিয়ে?
আল্লাহ! আমাদেরকে দাও স্বাধীনতার সুফল। দাও সুখ। দাও শান্তি। স্বস্তি অনিঃশেষ। দুশমনকে রুখে দাঁড়াতে দাও আরো অনেক শক্তি।

● কুরআনের উপদেশ

চলবো সত্য পথে আলোর পথে

> তোমাদের প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না। তাদের সাথে বলবে সম্মানসূচক নম্র কথা।
> *[বনী ইসরাইল ২৩.২৪]*
> আল্লাহর সন্তুষ্ট হবেন যদি পিতামাতা সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন পিতামাতা অসন্তুষ্ট হলে। *[বোখারী শরীফ]*

আশরাফ আলী থানভী র. বলেন, বাবা-মা যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয় তবুও তাদেরকে কষ্ট দেবে না। কথায়, কাজে এবং ব্যবহারে তথা জীবনের সর্ব অবস্থায় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। বাবা-মা কাফের হলেও তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। বাবা-মা মারা গেলে তাদের জন্য দু'য়া করবে। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করবে।

মা-বাবা এমন দু'জন মানুষ, যাদের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। যাঁদের জন্য লিখতে গেলে কলম থেমে যায়। শব্দরা মায়া-মমতা ও ভালোবাসায় থমকে যায়। মা-বাবা কষ্ট করে আর্মাদেরকে লালন-পালন করেছেন। বড় করেছেন। আমরা তাদের সেবা করবো, তাদের প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকবো। এটাই তাদের কামনা।

আমাদের প্রিয় নবী সা. কত সুন্দর করে বলেছেন– পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার মানেই হলো আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা। আর পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা মানেই হলো আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করা। আমরা ভালোবাসি আল্লাহ তায়ালাকে, প্রিয় রাসূল সা.কে। আমরা ভালোবাসি আমাদের মা-বাবাকে।

জীবনকে পরিচালিত করবো কুরআন হাদীস অনুযায়ী, চলবো সত্য পথে, আলোর পথে। আর সন্তান যদি আলোর পথে চলে তবে মা-বাবা খুশি হবেনই। খুশি হবেন আল্লাহ তায়ালাও।

তাই এসো এখনই শপথ নিই— আমরা পিতামাতাকে ভালোবাসবো, অনেক ভালোবাসবো।

আবু জাওয়াদ

প্রচ্ছদ
নামলিপি
বই
ম্যাগাজিন
ক্যালেন্ডার
ডায়েরি
পোস্টার
শপিং ব্যাগ
দাওয়াত কার্ড
রশিদ বই
ডিজিটাল সাইন
প্রসপেক্টাস
ভিজিটিং কার্ডসহ
সকলপ্রকার
ডিজাইন ও মুদ্রণ

কাজী যুবাইর মাহমুদ
আর্টিস্ট

কাজীরকাজ

১৮৯, খাবির প্লাজা [৪র্থ তলা], ফকিরাপুল
ঢাকা ১০০০। মোবাইল : ০১৮৩০ ৩৩৮১০৫
ইমেইল : kazijbr@gmail.com

কেমন আছো হে লাল-সবুজের প্রিয় স্বাধীনতা

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

এক.

স্বাধীনতা উচ্চারণ করলেই অনুভূতিতে মিষ্টি একটা ঝড় বয়ে যায়। শান্তির স্বস্তির তৃপ্তির। ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। রক্তের লালিমায় বর্ণিল। যেনো সকালের লাল সূর্য। স্নিগ্ধ আলোর মেলা। পাখির কূজনে স্বপ্নীল। আহা, স্বাধীনতা নিয়ে ভাবা— কী মজা! আচ্ছা বলো তো প্রিয় স্বাধীনতা! কেমন আছো তুমি! লাল-সবুজের ছায়ায়? তোমার সাথে আমি আজ কথা বলবো চিঠির ভাষায়। মনের ভাষায়। তুমি হাসলে আমিও হাসবো। তোমার চোখে অশ্রু দেখলে আমিও যদি কেঁদে ফেলি, ক্ষমা করে দেবে! আমি অশ্রুর ভেতর একদম হাসতে পারি না। আর্তচীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বজন-হারা মানুষের হাহাকার কী-যে বিঁধে এ বুকে!

দুই.

তোমার জন্ম হয়েছিলো ২৬ শে মার্চ। ১৯৭১ সালে। নয় মাস আমরা যুদ্ধ করেছি। ইস, তোমাকে পেতে কতো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কতো রক্ত ঝরাতে হয়েছে। কতো কতো শহীদের জানাযা পড়তে হয়েছে। তারপর তুমি এসেছো। এক রক্তনদী পেরিয়ে। সবুজেঘেরা লাল পতাকা উঁচিয়ে। বাংলার দামালদের অসাধারণ বীরত্বের মহিমা গাইতে গাইতে। আমরা তোমাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। হাসিমুখে। ভেজা চোখে। বলেছিলাম— এসো হে প্রিয় স্বাধীনতা! তোমাকে লাল সালাম।

তিন.

তোমাকে পেয়ে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম ভাই হারানোর শোক। নিপীড়িত প্রিয় বোনের কষ্টঘেরা মুখ। পুত্রের অপেক্ষায় বসে-থাকা মায়ের সাঁঝঘন চেহারা। সব পেছনে ফেলে তোমাকে দেখে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম। শোকের লাল সাগরে ভেসে ভেসেও হেসেছিলাম, পুষ্পের হাসি। বসন্ত বিরাজিত উদ্যানে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির মতন আমরাও সেদিন আনন্দে আহ্লাদে উড়েছিলাম। প্রিয় স্বাধীনতা! সে সব কি মনে পড়ে?

চার.

তোমাকে পেলাম অনেক দিন হয়ে গেলো। যুগ পেরিয়ে যুগ। আরো। আরো। ৪৬ বছর কি কম সময়? তুমি ছিলে শিশু। তারপর কিশোর। অতঃপর তরুণ। যুবক। এখন পরিণত। হাঁটছো প্রৌঢ়ত্বের দিকে। এখন তুমি ভালোই বোঝো— কে রেখেছে তোমার মান। কে দিয়েছে তোমাকে সম্মান। তুমি চেনো— কে তোমার শত্রু-মিত্র। কে বন্ধুবেশী দুশমন। তুমি আরো জানো— কে তোমার বাইরের শত্রু। আর কে ভেতরের।

প্রিয় স্বাধীনতা! কেমন আছো তুমি? আমরাই বা কেমন আছি তোমার চোখে? বলবে একটু? আমি বসি তোমার সামনে?!

তাকিয়ে আছি অপলক। স্বাধীনতার কথা শুনতে। স্বাধীনতার গল্প শুনতে। স্বাধীনতা কথা বলছে না। অশ্রু-ছলোছলো চোখে তাকিয়ে আছে লাল সবুজ পতাকাটার দিকে। এ দৃষ্টি আমার কাছে পরিচিত। স্মৃতিকাতর ভেজা দৃষ্টি। আমিও তাকালাম জাতীয় পতাকার দিকে। কী সুন্দর সবুজে আঁকা লাল।

পাঁচ.

তাকিয়ে আছি অপলক। স্বাধীনতার কথা শুনতে। স্বাধীনতার গল্প শুনতে। স্বাধীনতা কথা বলছে না। অশ্রু-ছলোছলো চোখে তাকিয়ে আছে লাল সবুজ পতাকাটার দিকে। এ দৃষ্টি আমার কাছে পরিচিত। স্মৃতিকাতর ভেজা দৃষ্টি। আমিও তাকালাম জাতীয় পতাকার দিকে। কী সুন্দর সবুজে আঁকা লাল। আশ্চর্য! আমার দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেলো। বললাম, কেনো কাঁদছো স্বাধীনতা? কেনো কাঁদাচ্ছো আমাকে? কথা বলো প্রিয় স্বাধীনতা! কী হয়েছে!

ছয়.

আমি স্বাধীনতা। মার্চের ২৬ তারিখে আমার জন্ম। ১৯৭১ সালে। বাংলার দামালরা আমাকে পেতে কী যে মরিয়া ছিলো! সশস্ত্র হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলো ওরা। কতো রক্ত বয়ে গেলো। কতো প্রাণ ঝরে গেলো। কতো বাগান উজাড় হয়ে গেলো। কতো ফুল-পাপড়ি না-পাক পায়ে দলিত হলো। রচিত হলো রক্তে রক্তে আঁকা— ত্যাগ ও বীরত্বের এক মহাকাব্য। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বাবা যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেন নি। ছেলে মাকে বললো : 'মা! আমি যাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে! দু'আ করো, যেনো ফিরতে পারি বিজয় নিয়ে!' কিন্তু ছেলে আর ফিরে আসতে পারে নি! এভাবে শহীদের জানাযার মিছিল লম্বা হতে লাগলো। শহর ছাড়ার এবং দেশ ছাড়ার হিড়িক বাড়তে লাগলো। আহত হলো কতো শতো জন, তার কোনো লেখা-জোখাই রইলো না। ওদের কেউ হাত হারালো। কেউ পা। রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে ধরাধরি করে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে এলো অনেককে। রক্ত রক্ত দেহ। লাল

লাল জামা। ওদের রেখে আবার রাতের আঁধারেই মিশে যেতো ওরা— রক্তের বদলা নিতে।

সাত.

না! এ রক্ত বৃথা যায় নি। হানাদার বাহিনী একদিন আত্মসমর্পণ করলো। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হলো বিজয়, মহাবিজয়। রক্তে আঁকা লাল বিজয়। পাক হানাদাররা আত্মসমর্পণ করলো। বিজয়ের আনন্দে লাল সবুজের পতাকায় বাংলাদেশের আকাশ ভরে গেলো। এতোদিনে আমি পূর্ণতা পেলাম। অসংখ্য অগণিত শহীদের আত্মা শান্তি পেলো। স্বপ্নহারানো পরিবারে শোক-আবহ ছাপিয়ে হেসে উঠলো সুখ-আবহ। তখন ওই কান্নাভেজা হাসি-হাসি মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো যেনো লাল সাগরের উপরে বয়ে চলেছে সুখের পানসী নাও! আহা, ত্যাগময় রক্তময় বিজয়ের পর সুখ কী বর্ণময়! যেনো বাগ-বাগিচায় পাখ-পাখালির মাঝে শত শত প্রজাপতির উড়ে বেড়ানো!

আট.

এভাবেই আমি বিজয়ের মধ্য দিয়ে ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করলাম। বরিত হলাম হৃদয়ে হৃদয়ে। ঠাঁই করে নিলাম ব্যথিত মনের নিভৃত কোণে। হয়ে উঠলাম সবার ভালোবাসা। আস্থা। ঐক্যের প্রতীক। দুঃখ লাঘবের ঠিকানা। ব্যথা ভুলে যাওয়ার উপলক্ষ। প্রিয় বিরহে কেবল কান্নার ভেতরে একটু হাসির ঝিলিক। আমাকে নিয়ে আবৃত্তি হতে লাগলো কতো কবিতা। উচ্চারিত হতে লাগলো এখানে ওখানে কতো আশার বাণী।

আগামী দিনের সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ নিয়ে আরো কতোজনের কতো আশাবাদ। আমি সে সব শুনি আর গর্বিতবোধ করি। আনন্দিত হই। সবুজ পতাকা নিয়ে ছোট ছোট শিশু কিশোর যখন ছুটে বেড়াতো খোলা মাঠের এ মাথা ও মাথা, তখন দেখতেই ইচ্ছে করতো। আনন্দে, সুখে গর্বে— চোখে পানি চলে আসতো!

এভাবেই চলছিলো আমার দিন।

নয়.

স্বাধীনতা লাভের মহাপ্রাপ্তিতে আকাশের মালিকের কাছে মাথা নত না-করে একটি মহল স্বাধীনতার স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় মেতে উঠলো। কেউ কেউ হয়ে উঠলো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী। গরীব আরো গরীব এবং ধনী আরো ধনী হতে লাগলো। অন্যায় অনাচারে অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এ চিত্র সত্যি আমি আশা করি নি।

আমি স্বাধীনতা বলছি। এরপর দিন যতো গড়াতে লাগলো আমার স্বস্তি ও প্রাপ্তি ততোই ম্লান হতে লাগলো। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ এবং নাগরিকেরা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নজর দিলেও একটা শ্রেণি ডুবে গেলো আকণ্ঠ দুর্নীতিতে। বাড়তে লাগলো মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে বেঈমানি। স্বাধীনতা লাভের মহাপ্রাপ্তিতে আকাশের মালিকের কাছে মাথা নত না-করে একটি মহল স্বাধীনতার স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় মেতে উঠলো। কেউ কেউ হয়ে উঠলো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী। গরীব আরো গরীব এবং ধনী আরো ধনী হতে লাগলো। অন্যায় অনাচারে অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এ চিত্র সত্যি আমি আশা করি নি। সহ্য করতে পারছিনে। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। দুঃখে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলাম। অবোঝ অযোগ্য লোভী অদূরদর্শী ক্ষমতাপাগল অত্যাচারীদের তাণ্ডবে আমি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম। দেখলাম একদিকে স্বার্থপররা স্বার্থের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে তরতর করে আর অন্যদিকে মানুষ ক্ষুৎ-পিপাসায় হাহাকার করছে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে থরথর করে। ক্ষুধার্তরা ব্যর্থ হলো— ভোজন বিলাসীদের মায়া কাড়তে। থরোথরো শীতে পড়ে-থাকা এই বৃদ্ধ কিংবা ওই শিশুটিও পারলো না— শীতের পোশাকে আপদমস্তক (পা থেকে মাথা পর্যন্ত) আবৃত বজ্জাত ধনীর দৃষ্টি কাড়তে।

স্বাধীনতা কথাবলা বন্ধ করে দিলো হঠাৎ!

দশ.

কথা বলো স্বাধীনতা?! কী হলো! আবার কাঁদছো?! আর শোনাবে না?! আমি শুনতে চাই! বেঈমান গাদ্দারদের ঠিকানা জানতে চাই! বলো স্বাধীনতা! বলো না?!

এগার.

না! স্বাধীনতা নীরব! শুধু কাঁদছে! অশ্রু গড়িয়ে বয়ে যাবে কি শোকনদী?! দুঃখনদী? একি! আমিও তো অঝরে কাঁদছি! ●

আলী ইমামের ছড়া

বৈরি

কোথায় তোমার সবুজ আঁচল বনের সীমারেখা
উঁচু পাহাড় সমান হল এমনতর দেখা।
বৃষ্টিধারার প্রবল তোড়ে পাহাড় গেল ধসে
পল্লবিত বৃক্ষশাখা পড়ল খসে খসে।
দাবানলে বনবনানি হচ্ছে পুড়ে ছাই
সবুজ যখন হারিয়ে গেছে কোথায় তাকে পাই?
আকাশ হল তামাবরণ মাটি পুড়ে খাঁক্
পাখির দলে থাকছে শুধু ধূসর পাতিকাক।
শহরগুলো মলিন হল ডাঁই জমানো বর্জে
নদীর ছোবল টেনে নিল অযুত লোকের ঘর যে।
সকল কিছুই ধসিয়ে দিতে আজ পরিবেশ তৈরি
সময় এখন প্রতিকূল এবং ভীষণ বৈরি।

কে আমি

সাইফ সিরাজ

'কে আমি' এই প্রশ্ন যখন—হঠাৎ করেই উঠল আমার মনে
কী পরিচয়? আমার হবে জানতে চেয়ে গেলাম বিজ্ঞ-জনে
জেনে নিলাম সত্য খবর, হাসবে দ্যুলোক আমার পরিচয়ে
সব অনাচার রুখে দিয়ে ন্যায়ের পথে ডাকবো নকীব হয়ে।

আদম হাওয়ার বংশে আমার জন্ম রবের অনিন্দ্য কুদরতে
ইব্রাহীমের দেওয়া নামে তাড়াই আঁধার এই মাটি-বুক হতে
আমার বুকেই মানব জাতির মুক্তি-সনদ নিত্য সজাগ রবে
সারা জাহান উঠবে হেসে ন্যায় বিচারের স্বরূপ সগৌরবে।

আমার জীবন খোদার হাতে বিক্রি করা জান্নাতি সুখ দিয়ে
চলার পথের পাই ঠিকানা আল কুরানের আসমানি ডাক নিয়ে
আমার ভেতর নুরে হেরার অলোক হাসি জাগছে সারা বেলা
স্বভাব আমার করব সদাই ইবলিসি সব কাজের মোকাবেলা।

আরব থেকে যেই আলো যায় বিশ্ব জুড়ে সুখের খবর দিতে
সেই আলোটা তাওহীদী ডাক—কাঁপায় জালিম মুক্ত পৃথিবীতে
আমার ভেতর ওয়াহদানিয়্যত সরব জাগে সব দ্বিধা বাদ করে
ভয় যত সব আসলে আসুক ভাঙ্গবো সবাই খোদার রশি ধরে।

হাত-মুখ আমার নিরাপদেই রাখতে পারে সকল প্রতিবেশী
গালিও নিষেধ করেন রাসূল—হত্যা হারাম সংযত তাই পেশি
বুকের ভেতর মহান বাণী; ফিতনা মিটায় আমার মুসলমানী
আমার সফর সুদূর হাশর; চাই অবিরাম নবীর হাতের পানি।

ঘুমের ভেতর বুক জুড়ে যেই আবু বকর মহান উমর জাগে
মিথ্যা-মুখোশ সব খুলে যায় খুন-পিয়সী শয়তানেরা ভাগে
এটাই ছিল আমার মতোন মুসলমানের—এই পৃথিবীর কর্ম
জুলুমাতের নির্মূলে তাই—জীবন বিলাই এটাই আমার ধর্ম।

আমি আমার দেই পরিচয় জোড় আওয়াজে মুহাম্মাদের উম্মত
আমার ভেতর চুপ-চেতনা জাগিয়ে তাই দূর করে দেই জুলমত।
মন মগজে আল্লাহ রাসুলু মিথ্যা বিনাশ করতে হবেই জানি
আমি খোদার গোলাম ছাড়া আর কিছু নই এ সত্য খুব মানি।

মানবতার আসল সেবক আমিই ছিলাম—হাজার বছর ধরে
গাফলতি ঘুম দেওয়ার পরেই উঠল জ্বলে আগুন আমার ঘরে।

তখন চাঁদ উঠেছিলো

এনায়েত রসুল

রাবিয়া জানত এমন হবেই। সন্ধ্যার পর পড়তে বসার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে। আর চারদিকে অন্ধকার নেমে আসবে। ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে প্রতিদিন অন্ধকার নেমে আসে— আজও নেমে আসবে। এটা একটা অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে রাবিয়ার। কিন্তু আজ সত্যি সত্যিই যখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, তখন ওর মন বিরক্তিতে ছেয়ে গেল। আর ধ্যাত্ বলে বইটাকে বন্ধ করল রাবিয়া। তারপর টেবিলের ওপর মাথা রাখল।

মা বাসায় নেই। তবে বাবা আছেন। কিছুক্ষণ আগেও তার ঘর থেকে ইসলামী সঙ্গীত শব্দ ভেসে আসছিল। সঙ্গীত শুনছিলেন বাবা। এখন বন্ধ। কী করছেন বাবা একা একা? অন্ধকারে ভয়-টয় পাবেন না তো?

বাবার কথা মনে পড়লে রাবিয়ার মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়। খুব ভালো লাগে বাবাকে। ওর মনে হয়, এমন ভালো বাবা আর একজনাও নেই। বাবাও ঠিক একই কথা বলেন। বলেন— আমার মেয়ের মতো ভালো মেয়ে আর একটিও নেই। সবার ছেলেমেয়ে যদি এমন হতো, বাবা-মা'দের মনে তাহলে কোনো দুঃখই থাকতো না।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। বাবা যখন এমন কথা বলেন তখন তার চোখ দুটো ঝলমল করে ওঠে। বাবার কথা ভাবতে গিয়ে রাবিয়ারও কী অমন হয়? তবে একটি কথা ঠিক, কার কথা যে সত্যি কার কথা মিথ্যে, ভেবে পায় না রাবিয়া। না কি দুজনার কথাই সত্যি?

পড়ার টেবিলে মাথা ছুঁইয়ে রাবিয়া যখন এসব কথা ভাবছিল তখন টিমটিমে মোম নিয়ে বাবা এলেন ঘরে। রাবিয়া মাথা তুলে তাকাল বাবার দিকে। বাবা বললেন, একা একা বসে আছিস। ভয় পাচ্ছিস না তো?

রাবিয়া বলল, না।

বাবা বললেন, তোর মা বাসায় নেই। আমি কী তোর পাশে বসব?

রাবিয়া বললো, তোমার ইচ্ছে হলে বসো। আমি কিছু বলবো না।

বাবা অবাক হলেন রাবিয়ার কথা শুনে। এমন করে তো কথা বলে না

রাবিয়া! কী হয়েছে মেয়েটার?
বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে মা? মন ভালো নেই?
রাবিয়া বলল, মন ভালো থাকার উপায় আছে, বলো! রোজ রোজ ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। অন্ধকার হয়ে যায় সবকিছু। অন্ধকার আমার ভালো লাগে না।
বাবা বললেন, আমারও ভালো লাগে না। জানিস তো কী ক্রিটিক্যাল সময় যাচ্ছে দেশটার। মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীত শুনছিলাম। ঝপ্ করে অফ হয়ে গেলো।
রাবিয়া বলল, সঙ্গীত তো তুমি পরেও শুনতে পারবে, বাবা। ওটা বারবার রিপিট হয়। কিন্তু আমার পড়া? পড়া কে তৈরি করে দেবে, বলো?
বাবা বললেন, আগামী মাসে একটা মিনি জেনারেটর কিনে দেব। অন্তত তোর ঘরে লাইট-ফ্যান চালাতে পারবি।
রাবিয়া বলল, সে তো আগামী মাসে। কিন্তু আজ? আজ আমি কী করব? গরমে মরে যাচ্ছি! ঘামে গা ছপছপ করছে! হোম ওয়ার্কের চিন্তায় মাথা ঘুরছে।
বাবা বললেন, কি বলব মা! এখন তো পড়া হবে না। তুই বরং ছাদে যা। ওখানে বাতাস আছে।
: তুমি? তুমি গরমে বসে হাঁসফাঁস করবে?
বাবার জন্য মায়া ছলকে উঠল রাবিয়ার কণ্ঠে। তা অনুভব করে বাবার মনও তৃপ্তিতে থইথই হলো।
বাবা বললেন, না মা, হাঁসফাঁস করব না। আমিও ছাদে যাব।
: আমার সঙ্গে? এক্ষুণি যাবে বাবা?
বাবা বললেন, ঠিক এক্ষুণি নয়— একটু পরে। আমি দরজাগুলো বন্ধ করে আসছি। তুই যা।

২.

তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। মেঘহীন আকাশে ভেসে থাকা চাঁদের গা থেকে ঝরনাধারার মতো ঝিরঝির করে আলোর ধারা নেমে আসছে। তুলো তুলো নরম আলো। সেই আলোতে ঝলমল করছে সারাটা শহর। জ্বলজ্বল করছে রাবিয়াদের ছাদ, ফুলের টব আর আশপাশের দালানকোঠা।
মন খারাপ করে ছাদে উঠেছিল রাবিয়া— মন ভালো হয়ে গেল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে, আলোর দিকে তাকিয়ে মন থেকে সব বিরক্তি মুছে গেল। আর এ মুহূর্তে রাবিয়ার ইচ্ছে হলো গান গাইতে। ইসলামী গান। কিন্তু কোন্ গানটা গাইবে সে? ইস্, এ সময় যদি বাবা থাকতেন পাশে, অথবা মা। তাহলে নিশ্চিন্তে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেত।
অবাক কাণ্ড! মা আর বাবার কথা মনে পড়তেই বাবা এসে হাত রাখলেন রাবিয়ার কাঁধে। রাবিয়া ঝট করে ঘুরে বলল, আমার ভালো লাগছে বাবা! খুব ভালো লাগছে। তোমার ভালো লাগছে না?
বাবা বললেন, হ্যাঁ, লাগছে। আমার ভালো লাগছে তোকে দেখে। তোর ভালো লাগছে কেন?
: আমার ভালো লাগছে চাঁদকে দেখে। চাঁদটার গায়ে কতো আলো, দেখেছ বাবা? কী উজ্জ্বল! কী ঝলমলে! বাবা! চাঁদকে তোমার ভালো লাগে না?
বাবা বললেন, খুব ভালো লাগে। তবে অবাক কাণ্ড কি জানিস? চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই।
: তাই? আলো নেই! তাহলে ওই যে ঝলমল করছে, ওগুলো কি মিথ্যে?
রাবিয়া অবাক চোখে ওর বাবার দিকে তাকালো।
বাবা বললেন, মিথ্যে নয়। আলো আমরা ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। তবে ওটা সূর্যের আলো। সূর্যের আলো গিয়ে চাঁদের গায়ে পড়ে। সেই আলো চাঁদের গা থেকে ঠিকরে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। তাই চাঁদকে ঝলমলে দেখায়। এসব বিজ্ঞানের কথা। বড়ো হলে জানতে পারবি।
রাবিয়া বলল, জেনে কাজ নেই। চাঁদের আলো নেই, কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। শোনো বাবা, আলো থাক বা না থাক, আমি চাঁদকে সব সময় ভালোবাসবো। আচ্ছা বাবা, চাঁদকে নিয়ে লেখা কোনো গান জান?
বাবা বললেন, গান তো অবশ্যই জানি। একটা গান নজরুল ইসলাম লিখেছেন : সেটা হলো আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে, আধখানা চাঁদ নীচে, আরো একটা গান আছে— চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে— তাই না বাবা?
বিজয়িনীর ভঙ্গি নিয়ে রাবিয়া বাবার দিকে তাকাল।
বাবা বললেন, হ্যাঁ, এ দুটো গান আমি জানি। তুই জানিস?
রাবিয়া বলল, পুরোপুরি জানি না। মায়ের কাছে দু-একবার শুনেছি। তবে তুমি গাইলে গাইতে পারবো। মায়ের সঙ্গে গাই।
বাবা বললেন, তাহলে আমার সঙ্গেও গা।

৩.

কিছুক্ষণ পর যখন মা এলেন। তখনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না— তবে অন্ধকারও ছিল না। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল চারদিক। বাবা গাইছিলেন— চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে— রাবিয়াও গাইছিল বাবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে মা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কেনো এই মুগ্ধতা? বাবা-মেয়ের উচ্ছলতা দেখে, না আলো ঝলমল জোছনা দেখে, মা তা বুঝতে পারলেন না। শুধু নিজের অজান্তে কণ্ঠে কণ্ঠ মেলালেন। সেই চাঁদঝরা জোছনা রাতে তিনটি কণ্ঠ মিলেমিশে এক হয়ে গেল। ●

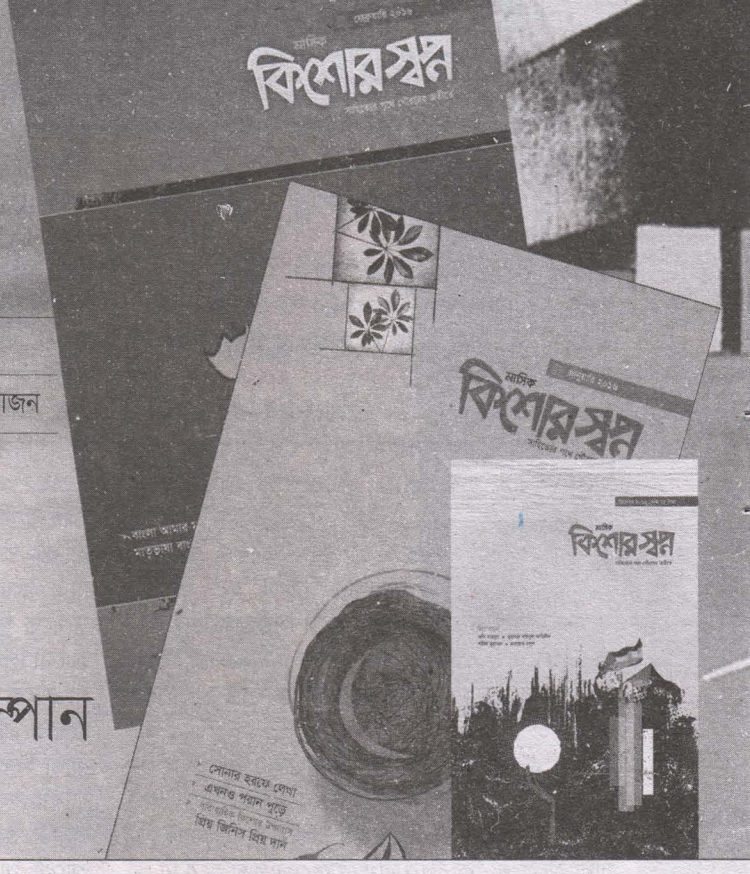

মাসিক কিশোরস্বপ্ন-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

কিশোরস্বপ্ন ভালোবাসার সাম্পান

লাবীব আবদুল্লাহ

অনেকদিন পর এসে নামলাম ঢাকায়। ঐতিহ্যের ঢাকা। আযানের শহর ঢাকা। ঢাকা মিনারের শহর। প্রাচ্যের ভেনিস এক সময়ের। বসন্তের ঢাকা অপরূপ। ফুলেল বর্ণিল ছায়া। পাখির কলরবে মুখরিত। এই ঢাকারই বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির একটি হলো বাড্ডা। বাড্ডা তিনভাগে বিভক্ত। মেরুলবাড্ডা, মধ্যবাড্ডা এবং উত্তরবাড্ডা। আমাদের ঠিকানা ও অনুষ্ঠান মধ্যবাড্ডায়। মোল্লাপাড়ায়। এখন ঐতিহ্যবাহী ও দেশের সবচে বড় লাইব্রেরি মাকতাবাতুল আযহারকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম সেরা কিতাববাজার। পাশেই দ্যুতি ছড়াচ্ছে মাকতাবাতুল ইসলাম। আরো অনেক মাকতাবা। এই বাড্ডায় একুশের পড়ন্ত— বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো মাসিক কিশোরস্বপ্ন-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব এবং মাকতাবাতুল ইসলাম-এর ৮টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা। বাড্ডার এই আড্ডা ছিলো তারকাদের। চাঁদের এবং সূর্যের। আড্ডা শব্দটি বেমানান হলেও এই আড্ডায় ছিলো স্বপ্নের দ্যুতি।। অবিনাশী চেতনার বিকাশকথা। স্লোগান। দীপ্ত উচ্চারণ। শেকড়ময় শিখরে ওঠার অভিলাষ। শিশু বয়সী একটি পত্রিকার জন্মকথা অতঃপর সেটিকে ঘিরে দেশের তারকা লেখকদের আশাবাদ, উচ্ছ্বাস ও দিক-নির্দেশনা। আবু সাঈদ যোবায়ের এবং গাজী সানাউল্লাহর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান জমে উঠতে সময় লাগেনি। একুশের ফুলেল ঢাকায় সমবেত হয়েছিলেন লেখক পাঠক ও প্রকাশক। লেখালেখির কক্ষপথে বিচরণ করলো তারকারাজি। আলো বিচ্ছুরিত করলো রাতের প্রথম প্রহরে। যথারীতি সূচনা হলো অনুষ্ঠানের কুরআনের অবিনাশী সুরে। নিবেদিত হলো হামদ-নাত। আরো কবিতা আবৃত্তি। সাঈদ কাদির ও ওয়ালীউল্লাহর কণ্ঠে নেমে এসেছিলো অদ্ভুত আবৃত্তিশিল্প। কিশোরস্বপ্ন এর নির্বাহী সম্পাদক এলেন ডায়াসে সূচনাকথা নিয়ে। সংক্ষেপে বললেন এর জন্মকথা। এ পর্যন্ত ভালোবাসাসিক্ত পথচলার গল্প।

বিকেল তিনটা থেকে শুরু এই ভিন্নমাত্রার আয়োজন। মাসিক কিশোরস্বপ্ন-এর পথচলা শুরু তিন মাস আগে। বাংলা সাহিত্যে বিনির্মাণের প্রত্যাশা নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু কিশোরস্বপ্ন-এর। দেশসেরা লেখকগণ কিশোর উপযোগী ভাষায় লিখে যাচ্ছেন এই কাগজে। স্বপ্নের নানা আয়োজন এই কিশোরস্বপ্ন-এ। এই ম্যাগাজিন পথের রাহবার। স্বপ্নের সারথী। বিষয়, ভাষা ও গদ্যশৈলীর চমৎকার আয়োজনে অন্য ম্যাগাজিন থেকে সহজেই পৃথক করা যায় একে। পাঠকের তীব্র আবেগ ছিলো এ জাতীয় একটি আয়োজনের। যেখানে পাঠক দেখবে তাদের প্রিয় লেখকদেরকে। গল্পকার, কবি ও ছড়াকারকে। উপদেষ্টা, সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদককে। এই আয়োজন একটি ভালোবাসার সেতু রচনা করলো।

পাঠক স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের দেখতে পেলো কাছ থেকে। শুনলো আশা ও প্রত্যাশার কথা। স্বপ্ন ও বাস্তবতার কথা। দ্রোহ ও চেতনার কথা। আবেগ ও ভালোবাসার কথা। পাঠক দেখলো যারা কিশোরে লিখে যাচ্ছেন তাঁরা কথাও বলেন সাবলীল ভাষায়। গুছিয়ে এবং বিশুদ্ধ ভাষায়।

বৈঠকে এলেন মাওলানা নাসীম আরাফাত। তিনি সাধারণত আড্ডাবিমুখ নিভৃতচারী। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম তিনি। খ্যাতিমান লেখক ও মুহাদ্দিস। আরবী ও বাংলায় তিনি সফল লেখক। তিনি কুসনতুনতুনিয়া বিজয়ী বীর মুহাম্মদ আল ফাতেহর কথা বলে স্বপ্নে উদ্বেলিত করলেন মজলিসকে। লেখক শরীফ মুহাম্মদ। মাসিক আলকাউসারের নির্বাহী সম্পাদক এবং টকশোর সফল আলোচক। সুবক্তা। প্রিয় ও পরিচিত পাঠকের কাছে তিনি, গদ্যশৈলীর ভিন্নধারার কারনে। এবং অমায়িক ব্যবহারের কারনেও। তিনি সম্পাদকের দায় এবং পাঠকের দায়িত্ব নিয়ে চমৎকার আশার আলো বিচ্ছুরিত করলেন। কী গর্জন শব্দে। বাঙ্ময় হয়ে ওঠে শব্দ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদের কণ্ঠে। লেখক মুহাদ্দিস এবং সাহিত্যের ক্লাস ও বক্তৃতার ক্লাসের লেখক মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন এলেন এই সুন্দর আয়োজনে। তিনি তাঁর নিয়মিত রুটিন ভেঙে পড়ন্ত— বিকেল থেকে শেষতক ছিলেন। দীপ্তকণ্ঠে কথা বলেন মাওলানা যাইন। কথা কবিতার মতো। পাঠক এই আয়োজনে ভিন্ন কিছু পেলেন। প্রথম পর্বে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের সাব এডিটর লেখক ও খতীব আলী হাসান তৈয়ব একুশে শহীদদের স্মরণে মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব করলেন। তিনি কথা বলেন বিশুদ্ধ ভাষায়। খুতবা দেন সাবলীল আরবী ভাষায়। বিকেলে কথা বলেন সৈয়দ শামসুল হুদা। নূর বিডি ডটকমের সম্পাদক তিনি। দিবসগুলোতে আমাদের আয়োজন না থাকলে আমাদের কোনঠাসা হতে হবে। এই দেশ আমাদের। এই মাটি আমাদের। দেশের ভালোবাসায় আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং অবদান রাখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান (সাবেক) প্রফেসর মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানীও বৈঠকে কথা বললেন। তিনি মাসিক আদর্শ নারীর এক সময়ের সবুজ কুঁড়ির পরিচালক। তিনি স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় তার দৃষ্টান্ত দিলেন নিজের জীবনের গল্প বলে। গবেষক আলেম ও লেখক শাইখ মুহাম্মদ উসমান গনীও কথা বললেন। বেলাশেষে এলেন শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক। মাসিক রাহমানী পয়গামের সম্পাদক এবং সুবক্তা। কথায় তিনি মুগ্ধ করেন লাখো শ্রোতাকে। শত ব্যস্ততার মাঝে তিনি এলেন এবং টার্গেট নির্ধারণ করে লেখকদের এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। তাঁর রাহনুমায়ী তারুণ্যের পাথেয়। তাঁর কথা গোছালো যা লিখলে মেদহীন প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আলফারুকও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনে দ্যুতি ছড়ালেন। মেহমানদের মন বোঝে বোঝে স্বাগত জানালেন। লেখক ও সংগঠক হুমায়ূন আইয়ূব, অনলাইন সাংবাদিকতায় অগ্রসর চিন্তার মিরাজ রহমানসহ একঝাক 'আবাবীল' কথা বললেন। এ ছাড়া অনেক পাঠক অনুভূতি প্রকাশ করলেন। প্রস্তাব দিলেন। মাকতাবাতুল ইসলামের মুঈনুদ্দীন মুহাম্মদ গালিব আবেগময় ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত দশটা তখন। বিরিয়ানির প্যাকেট হাতে হাতে। প্রিয় লেখকদের কথায় নিমগ্ন শত শত কিশোর স্বপ্নপ্রেমী। মনে হচ্ছিলো রাতব্যাপী যদি বাড্ডার আড্ডাটা চলতো! কিন্তু সবাই ব্যস্ত। এবং কিশোরস্বপ্ন-এর ভাবনা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে— এই প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ। তাই চেতনার মশাল জ্বালিয়ে ঠিকানা থেকে ঠিকানায় ফেরা। ফেরিওয়ালা স্বপ্নের। কিশোরস্বপ্ন সম্পাদক সবার প্রিয় মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী স্বপ্নের সাথীদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। আগামী প্রজন্মের ঈমান আমল বিশ্বাস ও দীনি চেতনা বিকাশ এবং সত্যিকার দেশপ্রেমী নাগরিক হিসাবে তাদেরকে গড়ে তোলার উপর জোর দেন। শুকরিয়া জানান আগত মেহমানদের।

সবশেষে মাসিক কিশোরস্বপ্ন-এর সম্মানিত উপদেষ্টা— মাকতাবাতুল আযহার-এর কর্ণধার মাওলানা ওবায়দুল্লাহ এলেন সবাইকে বিদায় দিতে। অতি সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি ঢেলে দিলেন গভীর আন্তরিকতা। সারা দেশ থেকে আগত লেখক পাঠক ও কিশোরস্বপ্ন প্রেমীদের বসন্তের ফুল উপহার দেন। কিশোরস্বপ্নকে সবাই একমুঠো ভালোবাসা দিয়ে হৃদয়ে ঠাই দেবে— এই মনোভাব নিয়ে প্রকাশনা উৎসবের চাঁদের হাঁট আবার বসবার ইচ্ছায় প্রথম বারের মতো শেষ হয়।

বাড্ডায় আড্ডা আরও হবে। আরো বড় আয়োজনে। বড় পরিসরে। ছড়িয়ে পড়বে ইনশা আল্লাহ কিশোরস্বপ্ন-এর স্বপ্ন সবখানে। সব মনে। সব মহলে। কাছে। দূরে। দেশে। বিদেশে। শেষে জানতে ইচ্ছে করে— হে দেশের কিশোর ও তারুণ্য! যাত্রী হবে কি তোমরা কিশোরস্বপ্ন-এর এ ভালোবাসার সাম্পানে? কিশোরস্বপ্ন তোমাদের টেবিলে আছে তো! ●

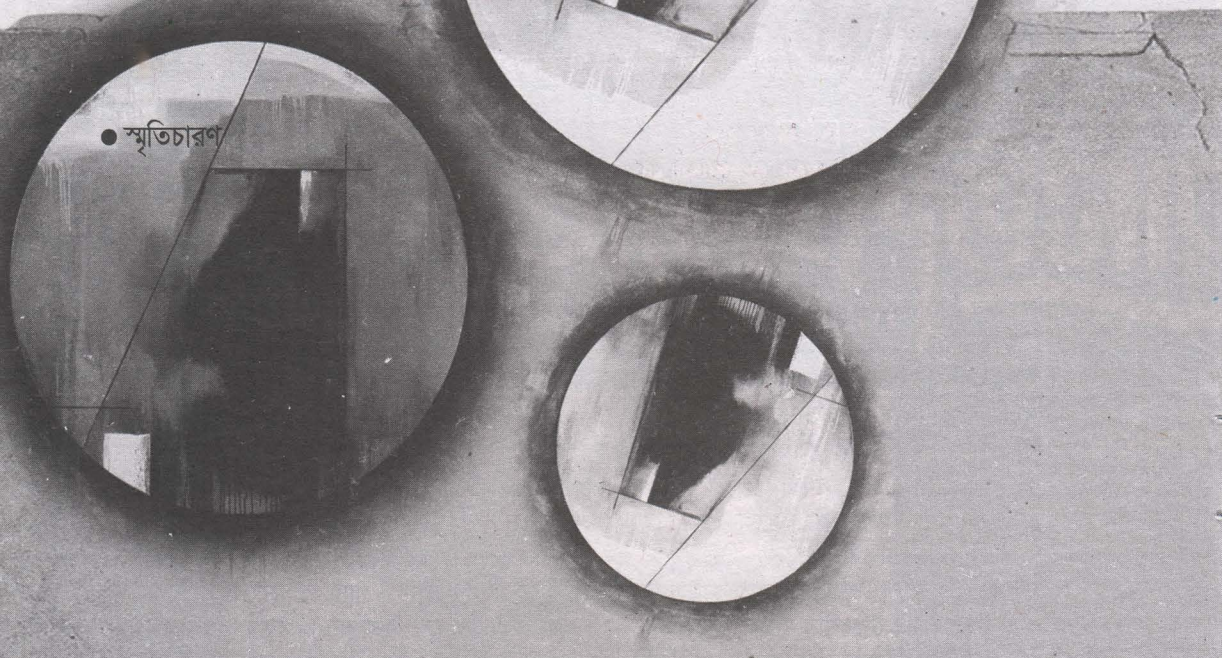

মাসিক কিশোরস্বপ্ন-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

চাঁদের মেলায় তারার হাঁটে, কিশোরস্বপ্ন

জিয়াউল আশরাফ

এক.

কিশোরস্বপ্ন! চুপি চুপি পৌঁছে গিয়েছিলো স্বপ্নচারীদের হাতে। তরুণদের হাতে। একটি দুটি নয়— তিন তিনটি সংখ্যা। জয় করে নিলো পাঠকের মন। শুরু করলো একমাসের অপেক্ষায় রাখা। পাঠকরা পড়ে আর পুলকিত হয়। আলোড়িত হয়। ভাবে— এটিই তো খুঁজছিলাম। স্বপ্ন! তুমি কোথায় ছিলে এতোদিন? তুমি আমাদের পরম বন্ধু। তুমি বন্ধু তাদের, যারা বিশ্বাসী, সৎ, সাহসী। তুমি তাদেরও বন্ধু, যারা পথহারা ব্যর্থ, ভুয়া দিবস-টিবস পড়ে চিন্তাটাকে নষ্ট করেছে। যাক সে কথা। কিশোরস্বপ্ন তুমি আসবে মাসে মাসে একবার দুবার নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ইনশাআল্লাহ।

দুই.

পাঠকের এই ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েই কিনা জানি না। তবে কিশোরস্বপ্নের উপদেষ্টা, মাকতাবাতুল আযহারের কর্ণধার মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ভাই বললেন, প্রকাশনা উৎসব হবে। আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব। সারাদেশ থেকে তরুণরা আসবে, বসবে কথা হবে। গল্প হবে। কিশোরস্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন দেখা হবে— সবাই এক সাথে। থাকবে বড়রাও। যারা শোনাবেন, এগিয়ে

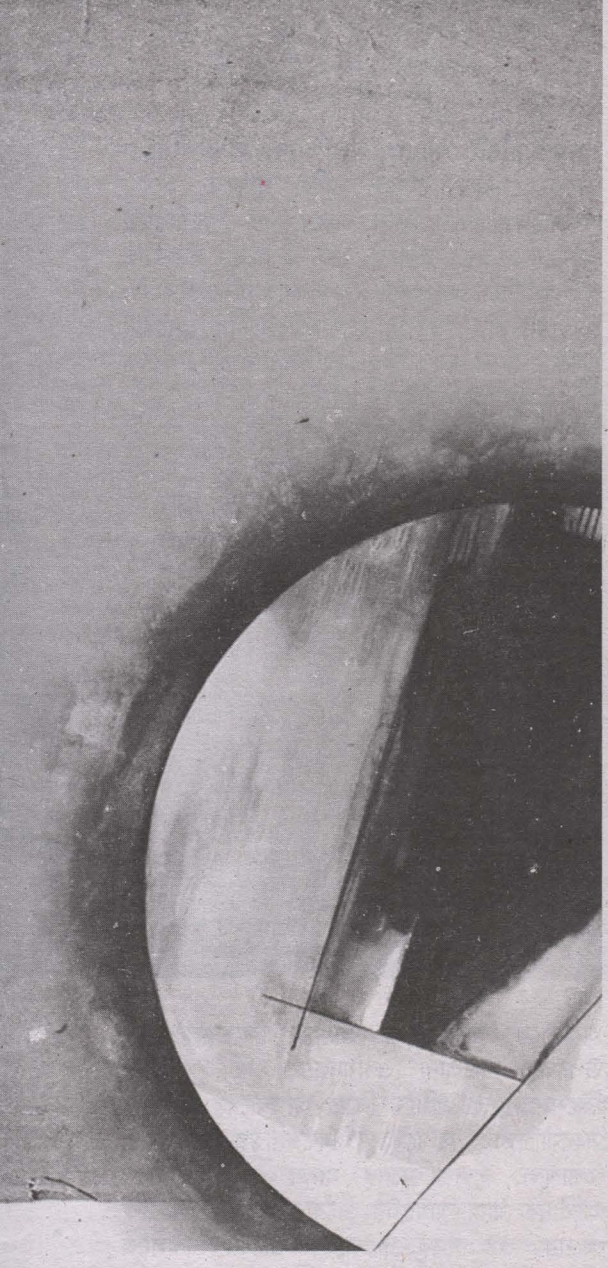

যাওয়ার গল্প, বড় হওয়ার গল্প। কিশোরস্বপ্ন-এর সম্পাদক তোমাদের প্রিয় লেখক ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী ও নিবার্হী সম্পাদক জিয়াউল আশরাফও যেন এমনটাই চাচ্ছিলেন, সাথে সাথে মেনে নিলেন সেই প্রস্তাব। শুরু হলো আয়োজনের পালা।

তিন.

২১ ফেব্রুয়ারি। রবিবার। দিনটি অন্যদিনের মতো নয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জেগে উঠেছে পুরো দেশ। আয়োজন চলছে দেশের বাইরেও। তবে কিশোরস্বপ্নকে ঘিরে মাকতাবাতুল আযহার প্রাঙ্গন ছিলো অন্য রকম। অনুষ্ঠান বিকেল ৩টায়। কিন্তু কিশোরস্বপ্নের লেখক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ীদের পদচারনায় মুখরিত সেই দুপুরের আগ থেকেই। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে চলে এসেছেন অনেক অনেক বন্ধু। উপদেষ্টা মহোদয় যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন মেহমানদের আপ্যায়নে। বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক আবদুল্লাহ আল ফারুক, যিনি কিশোরস্বপ্নকে একেবারে শুরু থেকে ভালোবাসায় মুড়িয়ে রেখেছেন, পুরো অনুষ্ঠানটি আয়োজনে, সৌন্দর্য বর্ধনে সব কিছু করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই মাকতাবাতুল ইসলামকে। আবু সাঈদ যোবায়ের ভাইকে। গালিব ভাইকে। যারা কিশোরস্বপ্নকে ঋণী করেছেন। দিয়েছেন হৃদয়ের ভালোবাসা।

চার.

৩টার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়ে যায় অনুষ্ঠান। উপস্থাপক গাজী সানাউল্লাহ। কুরআন তিলাওয়াত ও অনুপ্রাসের শিল্পিদের সঙ্গিতের মাধ্যমে শুরু। স্বাগত বক্তব্যের জন্য নাম ঘোষণা করা আমার, আমি বলেছি কিশোরস্বপ্ন নিয়ে অনের কথা। মূল কথা হলো, কিশোরস্বপ্ন তরুণদের। কিশোরস্বপ্ন বিশ্বাসের বীজ বপন করে। কিশোরস্বপ্ন সাহস, আর তারুণ্যের পথ চলার আলো। জীবন গড়ার কারিগর।

পাঁচ.

চারদিকে বসা চাঁদেরহাট। কি শ্রোতাদের সারিতে, কি মেহমানদের সারিতে। খুব মনে পড়ে মাকতাবাতুল ইসলামের স্বাপ্নিক প্রকাশক মুঈনুদ্দিন আহমাদ গালিব ভাইয়ের কথা, তিনি আগের দিন তার ফেইসবুকে লিখেছিলেন, চাঁদের হাট বসবে আমাদের বাড্ডাতে। চারদিকে রথি-মহারথিদের চেহারা। এক উৎসবমুখর পরিবেশ। একে একে আলোচনা করছেন প্রথিতযশা লেখকগণ। সকলের আলোচনায় উঠে আসে সাহিত্যের খোরাক আর কিশোরস্বপ্ন-এর স্বপ্নগুলো। স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে। চার দেয়াল ভেদ করে অনলাইন পাড়ায়। ফেইসবুক পাড়ায় তো রীতিমত ঝড় বয়ে যায়। এক বন্ধু লিখেই ফেললেন— ইস্! ফেইসবুক শুধু স্বপ্নময়, বাড্ডাময়'।

ছয়.

চাঁদেরহাট। চাঁদের মিলনমেলা। এখানে আলোচনা করেন অনেক অনেক লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক। তারমধ্য হতে আলোচনা করে ও উপস্থিত হয়ে যারা কিশোরস্বপ্নকে ধন্য করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন..

মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ, শাইখ মো. উসমান গনী, যুবায়ের মুহাম্মদ আশরাফ, নাসিম আরাফাত,

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, শরীফ মুহাম্মদ , মাওলানা মামুনুল হক, ড. মুফতি গোলাম রাব্বানী, হুমায়ুন আইয়ুব, মিরাজ রহমান, সৈয়দ শামসুল হুদা, আতিকুল্লাহ আতিক, আলী হাসান তৈয়ব, রায়হান মুহাম্মদ ইব্রাহিম, আবুল কাশেম আদিল, আবু বকর সিদ্দীক জাবের, গাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ, মনোয়ার হোসেন, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, সাইফ সিরাজ, ওয়ালিউল ইসলাম, সাজ্জাদ শরীফ, সাঈদ কাদির, এমদাদুল হক তাসলীম, তাজুল ফাত্তাহ, মাহবুব নোমানী, আবদুল্লাহ মাহমুদ, আঃ সাত্তার আইনী, আরিফুল ইসলাম, মোঃ ফজলুর রহমান (কুষ্টিয়া) ইসহাক গাজী, মোঃ জামিল (জীবনধারা) জামিল হাসান, কিশোরস্বপ্নের বিভাগীয় সম্পাদক মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিনসহ আরো নাম জানা সম্ভব হয়নি এমন অনেক বড় বড় লেখক ও সাহিত্যিক।

সাত.

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন সাহেব তার দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন— জাফর ইকবাল সাহেবগণ যে মন্ত্র দিয়ে তাদের বর্তমান জায়গাটা দখল করেছেন, সেটা দেখে হিংসে করলেই চলবে না, কিভাবে তারা এতদূর আসতে পেরেছেন তাও ভাবতে হবে। হুমায়ুন আহমদ আমাদের থেকে বাইরের কেউ নন। তিনি যখন আমেরিকাতে তার বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা নিয়ে হাজির হন, তখন তিনি নিজেই বলেছেন- আমার জানা যত সূরা কিরাত ছিল সব পড়েছি, এই সূরা কিরাত পড়ার বিশ্বাসটা কে বা কারা তৈরি করেছে? তা তো এদেশের আলেমরাই তৈরি করেছেন। তিনি বলেন- আজকের যারা সফল সাহিত্যিক তাদের সবটাই এক আল মাহমুদের টুপির ভিতর চলে আসে। হুমায়ুন আহমদ বলেছেন- আহমদ ছফা, আমার পীর। আর আহমদ ছফা যিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গ্রহনযোগ্য লেখক, তিনি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন জনাব আল মাহমুদকে। তার মানেটা কি? তার মানে হলো- টুপিওয়ালা আল মাহমুদই সকলের গুরু। আর আল মাহমুদ একজন বিশ্বাসী কবি ও সাহিত্যিক। তিনি মাওলানা তাকী উসমানী ও সীরাতে মোস্তফার লেখক আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, মাওলানা মনযূর নোমানী এর লেখার ভূয়ুশী প্রশংসা করেন।

বিশিষ্ট লেখক শরীফ মুহাম্মদ বলেন— সব লেখা পাঠের ব্যাপারে অপরিণত বয়সের তরুণদের সতর্ক থাকতে হবে। চিন্তার পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত তরুণ লেখকদের উচিত পরামর্শ করে পড়া, ভিন্ন চিন্তার লেখকদের সাহিত্য পড়ে লেখার ধারাশৈলী ও উপস্থাপনাশিল্প নেয়া গেলেও তাদের বিধ্বংসী চিন্তা থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতে হবে। কিশোরস্বপ্ন নিয়ে তিনি বলেন, এই কিশোরস্বপ্ন আমাকেও স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। একব্যাগ অপেক্ষা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। শত ব্যস্ততার ভেতরে অনেক পত্রিকার অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এই কিশোরস্বপ্ন-এ লেখা দেয়ার জন্য আমি নিজেই অপেক্ষায় থাকি!

কিশোরস্বপ্ন সম্পাদক ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী বলেন— মনে এত বেশি কথা জমে আছে যে, তা রাতদিন বলেও শেষ করা যাবে না। তিনি বলেন— ভবিষ্যতে এমন কোনো যন্ত্র যদি আবিস্কৃত হতো, যা মানুষের হৃদয়ে খেলে-যাওয়া সব ভাবনাকে একসাথে প্রকাশ করে দিতে পারে, তাহলে বুকে জমে থাকা অসংখ্য আনন্দ ও সৌভাগ্যের অনুভূতি আপনাদের সামনে এখন আমি মেলে ধরতে পারতাম। তিনি বলেন— অনেক স্বপ্নই লালন করি, সেই স্বপ্নের সামান্য প্রয়াস এই কিশোরস্বপ্ন। একটি ম্যাগাজিন আছে, যার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে জীবাণু। মুসলিম সন্তানদের ঈমান-আক্বীদা সুকৌশলে ধ্বংস করার গভীর প্রয়াস প্রতিটি লেখায় প্রতীয়মান। এর বিপরীতে সত্য ও সুন্দর কথাটি তুলে ধরার সামান্য চেষ্টা থেকেই এই কিশোরস্বপ্ন।

আট.

অবশেষে আলোচনায় আসেন কিশোরস্বপ্ন-এর উপদেষ্টা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ। তিনি বলেন, কিশোরস্বপ্নকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা লাগবে। কিশোরস্বপ্ন বিশ্বাসী, চিন্তাশীল, সুন্দর মনের মানুষ তৈরি করবে। আপনারা যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক অনেক কষ্ট করে এসেছেন তাদের সকলকে কিশোরস্বপ্ন ও মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ইনশা আল্লাহ।

নয়.

কিশোরস্বপ্ন ছড়িয়ে যাক সবখানে, সব হৃদয়ে। আমাদের তরুণরা পাক সুন্দর, সুস্থ বিনোদনের ঠিকানা। ফিরে আসুক হারানো বিশ্বাস, চেতনা। গড়ে উঠুক সোনালি দিনের সেই সোনার মানুষগুলোর মতো করে, যারা অন্ধকারের মাঝে জ্বেলেছিলেন আলোর মশাল। হতাশার আবরণ ছিন্ন করে দেখিয়েছিলেন সুন্দর স্বপ্ন। এনেছিলেন বিজয়। একদিন আমাদেরও বিজয় হবে। বিজয় হবে সুস্থ সংস্কৃতির। ●

সোনার হরফে লেখা

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো আমরা সকলেই চিনি। মা বাবা মামা চাচাদের মতোই চিনি। তাঁর জীবনে কত্তো মজার গল্প! দুঃসাহসের উপমা ছিলেন। যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করবেন ভাবলেন—তরবারীটা সঙ্গে করে সোজা চলে গেলেন হেরেম শরীফে। পবিত্র কাবার তাওয়াফ করলেন। দুই রাকাত নামায পড়লেন। দেখলেন—ওই তো মক্কার কাফের নেতারা বসে আছে। কাবার পবিত্র চত্বরেই। সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেতাদের মুখের উপর বললেন— তোমাদের কেউ যদি তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় এবং সন্তানকে এতিম করতে চায়, সে যেন ওই উপত্যকার পেছনে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়!

ওমরের সামনে এসে দাঁড়াবে—এমন সাহস কার আছে বল! কেউ আসেনি!

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সোজা চলে যান মদীনায়—নবীজির প্রিয় শহরে। দুঃসাহসী ওমরের দানের সাহসও ছিল অসামান্য।

একবার হলো কি জান—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে দান করতে বললেন। ওমর বলেন—ভাবলাম ঘরে তো পয়সা আছে। আজ এত দান করব যেন আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে

পারি। ঘরে গেলাম। যা কিছু ছিল তার অর্ধেক এনে নবীজির দরবারে পেশ করলাম। নবীজি বললেন— পরিবারের জন্য কিছু রাখনি?
: অর্ধেক এনেছি আর অর্ধেক রেখে এসেছি।
এমন সময় এলেন আবু বকর। যা এনেছেন নবীজির খেদমতে পেশ করলেন!
: পরিবারের জন্যে কিছু রেখেছ?
: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি!
বুঝলাম, আবু বকরের সঙ্গে লড়াই করার লোক আমি নই। আর কোন দিন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করতে যাব না।
[আততারগীব ওয়াত তারহীবের সূত্রে-আল্লাহ ছে শরম কিজিয়ে: ১৭৫পৃ.]
এবার বুঝ হযরত আবু বকর রা. কত বড় দানশীল ছিলেন! হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুসলমান হন তখন তার হাতে চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল। সেকালের বিচারে এটা অনেক বড় অঙ্ক। এই পয়সা দিয়ে অনেক দুর্বল ক্রীতদাস মুসলমানকে কিনে আজাদ করেছেন। আর দান করাটা তো ছিল খানাপিনার মতোই সাধারণ স্বভাব। একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আবু বকরের পয়সা আমাকে যে উপকার করেছে আর কারো পয়সা সে উপকার করেনি। একথা শুনে হযরত আবু বকর রা. কাঁদতে শুরু করেন আর বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ তো আপনার জন্যেই! *[উসদুল গাবা-৩:২২২ এর সূত্রে-ঐ:১৭৫পৃ.]*

সত্যি কথা কী—হযরত ওমর ছিলেন সত্যের পক্ষে আপসহীন। ওমরের ভেতরে একজন পরম কোমল ওমর বাস করতেন—এই কথাটা অনেকেই বুঝতে চাইত না!

দানের মনটা ছিল কেমন তার একটি সরাসরি উপমা দিই
নবীজির বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু। ঠেকায় পড়ে একবার হযরত আবু বকরের কাছে এলেন। আবু বকর তাকে কিছুই দিলেন না। আবার এলেন। আবু বকর এবারও কিছুই দিলেন না। তৃতীয়বার এসে বললেন—এবার যদি আমাকে কিছু না দেন তাহলে বুঝব আমার সঙ্গে কৃপণতা করছেন। বলতে পার— সরাসরি হুমকি! এবার হযরত আবু বকর রা. বললেন— তুমি যতবার কিছু চাইতে এসেছ ততবারই আমি তোমাকে একহাজার দেরহাম দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। এই বলে একবারে হিসাব করে আমাকে তিন হাজার দেরহাম দান করেন। *[ঐ-১৭৫]*
দেখলে?
আরেকবার হযরত ওমরের কথা বলি। হযরত ওমর তখন আমীরুল মুমিনীন। অর্ধ পৃথিবীর শাসক! তার এক আত্মীয় এসেছেন। ওমর তাকে ধমক দিয়ে বের করে দেন। একজন আত্মীয়কে ধমক দিয়ে এভাবে বের করে দেয়ায় উপস্থিত অনেকেই অন্য চোখে দেখে! একজন সাহস করে বিষয়টি জানতে চায়। হযরত ওমর রা. তখন বলেন— ও সরকারি তহবিল থেকে সাহায্য চাইতে এসেছে। সরকারি তহবিল থেকে পয়সা দিয়ে কেয়ামতের দিন কী উত্তর দেব? ওর চাওয়ার থাকলে আমার কাছে চাইত! তারপর তিনি সেই ব্যক্তির জন্যে দশ হাজার দেরহাম পাঠিয়ে দেন! *[ঐ-১৭৬পৃ.]*
সত্যি কথা কী—হযরত ওমর ছিলেন সত্যের পক্ষে আপসহীন। ওমরের ভেতরে একজন পরম কোমল ওমর বাস করতেন—এই কথাটা অনেকেই বুঝতে চাইত না!
একটা ঘটনা বলি— রাত! খুব শীত পড়েছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুই তখন মুসলমানদের শাসক। বেরিয়েছেন জনগণের অবস্থার খোঁজখবর নেয়ার জন্যে। লক্ষ করলেন— এক জায়গায় বাতি জ্বলছে। এগিয়ে গেলেন। কাছে যাওয়ার পর দেখলেন— একজন নারী বসে আছেন। পাশে তার শিশুরা । সামনে চুলোর উপর একটি পাত্র। শিশুরা কাঁদছে, চেচাচ্ছে! ওমর আরেকটু কাছে গেলেন।
: আসসালামু আলাইকুম!
: ওয়াআলাইকুম সালাম!
: এই শিশুরা কাঁদছে কেন?
: ক্ষুধায় কাঁদছে...
: চুলোয় কি?
: পানি! ওরা আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে— এই জন্যে...
ওমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন শহরে। দ্রুত ফিরে এলেন আটা ও যায়তুনের তেল নিয়ে।

তারপর পাতিলের ঢাকনা তুলে তাতে আটা ও যায়তুনের তেল ছাড়তে লাগলেন এবং নাড়াতে লাগলেন। রান্না হওয়ার পর বললেন—একটা থালা দাও। থালায় নিজ হাতে খাবার ঢেলে দিলেন। তারপর ওই মহিলাকে বললেন— এবার তোমার শিশুদের খেতে দাও! তারপর শিশুরা খেয়ে দেয়ে হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়ে! *[আলআরাবিয়্যাতু লিননাশিইন-৪: ৪৪]* এই হলো ভেতরের ওমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু!

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু—ইসলামের তৃতীয় খলীফা! আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই দুলালীর স্বামী। এই জন্যে তাকে যিন-নূরাইন—দুই নূরের অধিপতি বলা হয়। ছিলেন বিশাল সম্পদের অধিকারী। তাই তাকে উসমান গনী—ধনী উসমান বলা হত। যেমন ধনী ছিলেন তেমন ছিল দানের হাত। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রয়োজনে পয়সা উপুর করে ঢেলে দিতেন! তাবুক যুদ্ধের সময় নবীজি খুব পেরেশান! অনেক দূরে যেতে হবে । লোকবল অর্থবল দু'টোই চাই। বিষয়টি সবাইকে জানালেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উপলক্ষে তিনশ উট দান করেন। সেই সঙ্গে এই তিনশ উটে করে যতজন জিহাদে যাবে তাদের যাবতীয় ভারও তিনি গ্রহণ করেন। এরপর একহাজার স্বর্ণমুদ্রা আঁচলে করে নবীজির সামনে এনে ঢেলে দেন। নবীজি তাঁর এই দানে এতটাই মুগ্ধ হন—মুদ্রাগুলো হাতে নিয়ে নাড়তে থাকেন আর বলতে থাকেন—

এই ঘটনার পর উসমান যাই কিছু করুক তার আর কোনো ক্ষতি হবে না।

আরেকবারের কথা। মদীনা শরীফে পড়ল দুর্ভিক্ষ। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ব্যবসায়ী। সিরিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবানিজ্য। এই দুর্ভিক্ষের সময় একশ উট খাদ্যদ্রব্য আনতে পাঠান সিরিয়ায়। যখন খাদ্যবোঝাই এইসব উট মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌঁছায়, মদীনার সব ব্যবসায়ী হযরত উসমানের বাড়িতে গিয়ে উঠেন। সোজা হযরত উসমানকে তারা প্রস্তাব করেন—আপনি যত দেরহামের খাদ্য এনেছেন আমরা ঠিক সেই পরিমাণ লাভ দেব—খাদ্যগুলো আমাদের দিয়ে দিন!

: দাম এরচে বেশি আগেই উঠেছে! হযরত উসমান বললেন!

: তাহলে দ্বিগুন লাভ দিই! ব্যবসায়ীরা বলল!

: না আরো বেশি উঠেছে...

: তিনগুন দিই

: না...

: চারগুন,পাঁচগুন...

: আরো বেশি আগে থেকেই উঠে আছে..

ব্যবসায়ীরা তো অবাক। তারা বলল— এই মদীনায় আমাদের বাইরে তো আর কোনো ব্যবসায়ী নেই! কে আপনাকে পাঁচ গুনেরও বেশি মুনাফার কথা বলল!

: আল্লাহ তায়ালা দশগুন দেবেন বলে কথা দিয়েছেন! তোমরা কি এরচে বেশি দিতে পারবে?

: না তাতো সম্ভব নয়!

: তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো— এই সকল খাদ্য আমি মদীনার গরীবদের দান করে দিলাম! তারপর পুরো একশ' উট খাবার মদীনার অভাবী দরিদ্রদের ভাগ করে দেন! *[সালমান মনসুরপুরী, আল্লাহ ছে শরম কিজিয়ে-১৭৬-১৭৭ পৃ.]*

নবীজির যুগে মুসলমানদের হাতে পয়সা ছিল না। তাদের মসজিদ ছিল ছোট। দিন দিন মুসলমান ও মুসল্লী বাড়ছে। মসজিদে জায়গা হচ্ছে না। একদিন নবীজি বললেন— মসজিদের জন্য যে একটু জায়গা কিনে দিবে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে তার চে উওম জায়গা দিবেন! হযরত উসমান এক টুকরো জায়গা কিনে দেন। এখন যে আমরা মদীনায় গিয়ে নবীজির মসজিদে নামায পড়ি— এটা সেই মসজিদের কথা! মুসলমানদের ইতিহাস কতভাবে যে ঋণী এই উসমান রা. এর কাছে। মুসলমানগণ যখন মদীনায় আসেন তাদের পান করার মতো কোনো মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিল না। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন 'রুমা' নামের মিষ্টি পানির কূপটি কিনে দান করে দেন। *[যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা-২: ৬০১। তরজমা:৪]*

এই কূপের গল্পটিও বেশ মিষ্টি!

কূপটির মালিক ছিল একজন ইহুদি। মুসলমানদের মিষ্টি পানির ব্যবস্থা নেই। কারণ পুরো মদীনায় ওই একটিই মিষ্টি পানির কূপ। তাই সে চড়া দামে পানি বিক্রি করত। এবার বুঝ— এর নাম ইহুদি! হযরত উসমান তাকে ডেকে কূপটি কেনার প্রস্তাব দিল! কিন্তু সে বেঁচবে না। এত বড় ব্যবসা কেউ ছাড়তে চায়?

এবার হযরত উসমান বুদ্ধি খাটালেন। বললেন- এক কাজ কর। আমি তোমাকে অনেকগুলো পয়সা দিই। তুমি অর্ধেকটা কূপ আমার কাছে বেঁচে দাও। আর সেটা এভাবে- এর পানি একদিন তোমার আরেক দিন আমার। ইহুদি দেখল— ভালোই তো! একসঙ্গে অতগুলো পয়সাও পেলাম আর কূপ তো থাকলই। রাজি হয়ে গেল। উসমান তাই করলেন। তারপর মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন— যেদিন আমার পালা সেদিন তোমরা ইচ্ছা মতো পানি তুলে রাখবে।

ক'দিনপর ইহুদি দেখলো— আর কেউ তার কাছে পানি কিনতে আসে না।

দেখলে— এ হলো বুদ্ধির জয়।

মন ও বুদ্ধি থাকলে শত্রুকে এভাবেই নিরাশ করা যায়। ●

পুরনো কালের ছবি

শরীফ মুহাম্মদ

পানি আর টংবাড়ি। বাঁশের ছোট ছোট মাচার উপর। মাদরাসা থেকে বের হলেই দেখি। যাওয়ার জায়গা নেই। মাদরাসা নূরিয়া। সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচল। পায়ে হেঁটে। এদিক-ওদিক। অল্প কিছুদূর। বেশি দূর গেলেই রাস্তা পানির নিচে। কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর। বর্ষার মৌসুমটা এমনই ছিল। বছরের শুরুটা এমনই ছিল। মনটাও পানি পানি। ভেজা ভেজা। ছোটখাটো আনন্দের রেশ পেলেই আবার খুশির ঝিলিক। এভাবেই দিন। এভাবেই রাত। চলে যাচ্ছিলাম আমি। তখন উনিশ শ তিরাশি সন।

হঠাৎ একদিন ময়মনসিংহ-হুজুর বললেন, আসরের পর কিছু সূরা হেফজ করে শোনাতে হবে। ইয়াসীন। আররাহমান। ওয়াক্বিআ। মুলক। তিনি আমার অভিভাবক। কিন্তু তাঁর এ কথায় মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়লো। কীভাবে ইয়াদ করবো! কীভাবে শোনাবো! সব ছাত্র হাঁটবে, ঘুরবে। আমিই কেবল পড়বো! বিকেলের হাঁটাহাঁটি শেষ! আমার ফাঁকিবাজ চোখ ধরা পড়ে গেলো। হুজুর ছাড়লেন না। শুরু হলো হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা। আসরের পর। সূরা শোনাতে থাকা। একটু একটু করে। বিকেলে ছাত্ররা সব ঘুরে। গল্প করে। আমি শুধু হুজুরের সঙ্গে হাঁটি। এক সপ্তাহ-দুসপ্তাহ গেল। গেল আরো কিছুদিন। দু-তিনটি সূরা শুনিয়েই আমি চম্পট। পালাই পালাই। হুজুর দিলেন ঢিল। আর হলো না আমার। বর্ষার পানি শুকিয়ে গেছে। এরই মধ্যে। ভেসে উঠেছে মাটি। ফসলের ক্ষেত। অপূর্ব খেলার মাঠ। মাদরাসার ছাত্রদের খেলা। এখানে ওখানে। ফুটবল। গোল্লাছুট। হা-ডুডু। আসরের পরের ব্যস্ততা বড় হয়ে গেল। সারাদিনের অপেক্ষা। যেন সারাদিনের অক্সিজেন।

হাসিখুশি বিকেল। হইচই, খেলাধুলা। মাঠ। বিকেল ছাড়া সারাদিন পড়া। পড়ার পরিবেশে থাকা। রাতের দৃশ্যও এক। নামাযের জামাতে দশমিনিট আগে মসজিদে যাওয়া। লাইন ধরে। চুপচাপ বসে থাকা। ফরয। সুন্নত। আবার চলে আসা। সুশৃঙ্খল। কোনো কোনো দিন ভিন্ন। নামাযের পর বয়ান। দুআ। সকাল-বিকেলে বোর্ডিং (মাতবাখ) থেকে খানা তোলা। টিফিনক্যারিয়ার। টিকিট। হাফ-ফুল। লাল-নীল-সবুজ। কেরামের গুটির মতো। প্লাস্টিকের চাকতি। কাউন্টার। ভিড়-লাইন। ঠেলা-ধাক্কা। মন

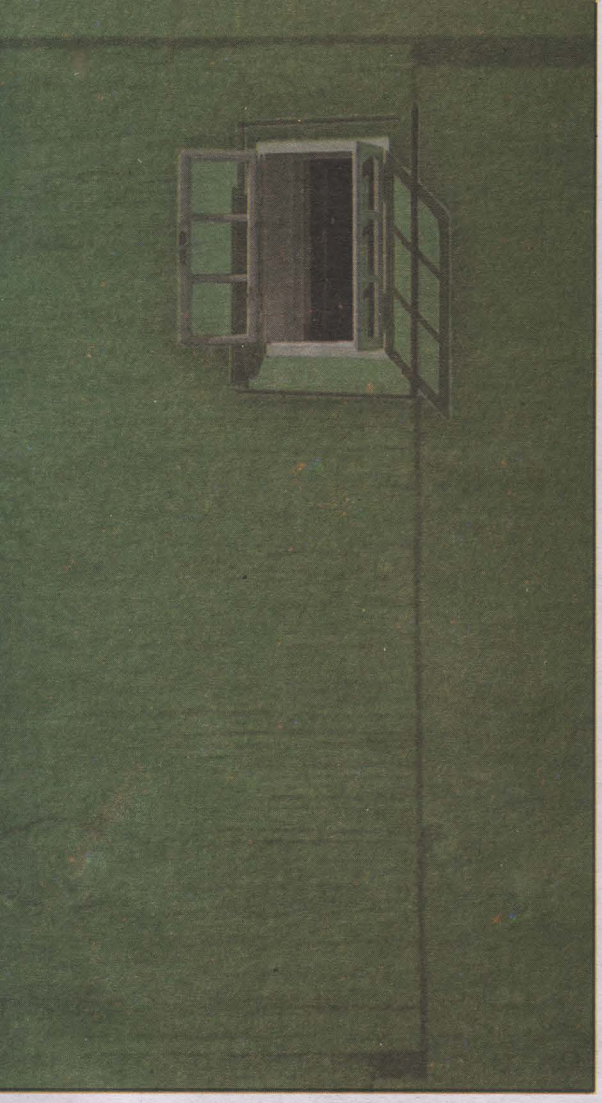

খারাপ। কিচ্ছু করার নেই। খানা এনে খেতে বসে যাওয়া। সবার সঙ্গে। আবার একা। নিজের মধ্যে। কেউ নেই ক্লাসে আমার। আত্মীয়, পরিচিত, এক-এলাকার। আনমনা হয়ে যাই। প্রায় প্রায়ই। একপাশে চুপচাপ বসে থাকি। আমার উচ্চারণের রেশ ধরে সহপাঠীরা মজা করে। খাইছুইন। যাইবাম। গুটিয়ে যাই। হঠাৎ হঠাৎ উদাস-করা শব্দ কানে আসে। দূর থেকে, দূরলয়ে। ঝিকঝিক। ঝিকঝিক ...। শব্দ চলমান। ঘুমের আগে। সকাল-সন্ধ্যায়। নদীতে চলা ট্রলারের একটানা সুর। ছোট লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দ। মন উড়ে যায়। দূরে আছি। আমি একা। মনে পড়ে যায়। কই যাই! কই যাই! ঝিকঝিক ঝিকঝিক। হু হু হু হু। চোখ মুছি।

এক সন্ধ্যায় পড়তে বসেছি। সবার সঙ্গে। তাকরার। হঠাৎ মনে মনে আমি একা। ট্রলারের শব্দ। ঝিকঝিক ঝিকঝিক। মুহূর্তেই চোখে আম্মার মুখ। বাসা। ছোট বোনদের হইচই। খেলার মাঠ। বাঁশঝাড়। মসজিদ। কান্না আসতে শুরু করে। সহপাঠীরা হাসে। কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাই। মসজিদ পার হয়ে উত্তর দিকে। মসজিদের পশ্চিম কোণে ছোট্ট দোতলায়। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠি। উঠেই দেখি, হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব (ময়মনসিংহ-হুজুর) কিতাব পড়ছেন। মুতালাআ করছেন। লম্বা কামরার ওই মাথায়। গভীর মনোযোগে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সালাম দিই। হুজুর চোখ তুলেন। অবাক হয়ে তাকান। 'কী ব্যাপার, এখন কেন এসেছো?' আমি মনের বাঁধ খুলে দিই। 'হুজুর! খুব কান্দা আসতেছে। আম্মার কথা, বাসার কথা মনে পড়তেছে। ভালো মতো কাঁদতে পারতেছি না।'

হুজুর তখনই বললেন। একদম আমার ভাষাটাই তাঁর মুখে। 'আম্মার কথা মনে করে কাঁদা তো ভালো জিনিস। এটা খারাপ কিছু না। আমিও ছোটকালে মাদরাসায় পড়ার সময় বাড়ির কথা, আম্মার কথা মনে করে কেঁদেছি। তুমিও কাঁদো। ওইখানে বসে কাঁদো। যতক্ষণ মনে চায় কাঁদো। এশার সময় হলে আমরা নামায পড়তে যাবো।'

ঠিকঠাক হয়ে বসেছি। মনে বড় শান্তি পেলাম। হুজুর কাঁদতে বলেছেন। একানে ছাত্ররা নেই। কাঁদতে কোনো লজ্জা নেই। সমস্যাও নেই। মনভরে কাঁদবো। কিন্তু দেখি কি, কান্না আর আসছে না। দশ মিনিটের চোখ-মুখ শুকনো। আবার উঠে গিয়ে হুজুরকে সালাম দিলাম। হুজুর তাকালেন। আমি বললাম, 'অনেক কেঁদেছি তো, আর কান্না আসছে না। এখন কামরায় চলে যাই?' হুজুর স্মিত হাসলেন। বললেন, 'যাও, কামরায় গিয়ে তাকরার কর। যখনই কান্না আসবে, চলে আসবা।'

এরকম অনেক ঘটনা। অনেক বিড়ম্বনা। অনেক যন্ত্রণা। হযরত ময়মনসিংহ-হুজুরকে দিয়েছি। বিপরীতে তিনি সময় দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন। সহ্য করেছেন। ধরে রেখেছেন। তা না হলে হয়তো আমি হারিয়ে যেতাম। কিংবা হারিয়ে যেতো আমার শিশুবেলা। শিশুবেলার নরমতা।

সেই সময় একদিন। ওয়াসেল এসে হাজির। খালাতো ভাই। বছর তিনেক বড়। সঙ্গে খালু। হেফজ শেষ করে উর্দূ কায়দা-পহেলি পড়ছিল। ময়মনসিংহেই। আমি মাদরাসা নূরিয়ায় ভর্তি হয়েছি। আব্বার সঙ্গে খালুর কথা হয়েছে। সে শুনেছে। চলে এসেছে। এসেই ভর্তি হয়ে গেছে সালেসে। তৃতীয় শ্রেণিতে। আমার এক ক্লাস উপরে। তাইসির-ফার্সি পহেলি তার কিতাব। একই কামরার দুপাশে দুটি শ্রেণি। দ্বিতীয়, তৃতীয়। সানি, সালেস। বেশির ভাগ সময় একসঙ্গেই থাকি। দেখা হয়, কথা হয়। বিরাট ব্যাপার। আমার খুব ভালো লাগলো। দূরদেশে একা-জীবনে আপন মানুষের দেখা পাওয়ার মতো। তারও অভিভাবক ময়মনসিংহ-হুজুর। আমরা একসঙ্গে নাস্তার টাকা

আনি। একসঙ্গে নাস্তা খাই। বিকেলে হাঁটি-খেলি। কিন্তু ক্লাস আলাদা। আমার মন বেঁকে বসলো। আবদার করলাম ময়মনসিংহ-হুজুরের কাছে। 'আমিও তৃতীয় শেণিতে পড়বো। ইনশাআল্লাহ পারবো।' ওয়াসেলও আমাকে সাহস দিল। বললো, পড়া একরকমই। একটু চেষ্টা করলেই হবে। হুজুর আমাকে দরখাস্ত লিখতে বললেন। এক ছাত্রভাই সাহায্য করলো। দুজন উস্তাদের কাছে গেলাম। মঞ্জুর হয়ে গেল। ভর্তির মাসখানেকের মাথায়। আমি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র হয়ে গেলাম। আখতান তলোয়ার খিঁচনা আখাদ আখতাদ। ধুমিয়ে মুখস্থ করতে শুরু করলাম। মাসদার, ফেয়েল, গরদান আর সিগার জগতে হুটহাট ঢুকে পড়লাম।

মাদরাসায়ে নূরিয়া তখন জমজমাট। পড়া, নিয়ম, আমল। মুখরিত। হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ) আসেন। সপ্তাহের কোনো কোনো দিন। নিয়ম করে বৃহস্পতিবার। আসরের আগে-পরে। বাদ মাগরিব দরূদ শরীফের খতম। মসজিদজুড়ে সব ছাত্র। খতম শেষে বয়ান। বয়ন করেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ)। নব্বুই-পেরুনো বয়স। ভাঙা ভাঙা স্বর। দূর থেকে অস্পষ্ট। আমাদের একজন উস্তাদ বুঝিয়ে বলে দেন সে বয়ান। কিছুক্ষণ পর পর। হাফেজ্জী হুজুর (রহ) মেহরাবে বসা। হাতে তাসবিহ। মুখ এদিক-ওদিক আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলেন। আমরা তাকিয়ে থাকি সে মুখের দিকে। মেহরাবের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করি। আগ্রহী ছাত্রভাইদের ভিড়-ধাক্কা। পারি না। ঘাড় কাত করে মাথা উঁচু করে দেখি। দেখতে থাকি। দেখার চেষ্টা করি। এশার নামাযের পর ছুটি। ফজরের আগে থেকে আবার নামায-দুআ। ফজরের পর তেলাওয়াত। ঘণ্টা খানেক। আবার বয়ান। হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ) ক্লান্তিহীন। আটটার দিকে ছুটি। শুক্রবার।

হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে দেখতে, দেখা করতে অনেকেই আসতেন। বাইরে থেকে। এই দুইদিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। শুক্রবার বাদ ফজর। ছোট-বড়। দেশি-বিদেশি। আমরা শুধু চোখ মেলে দেখতাম। আর দেখতাম নূরিয়ার অচেনা উস্তাদদেরকে। কেউ তন্ময় হয়ে হাঁটছেন। কেউ তেপায়া সামনে লিখছেন। কেউ বেত হাতে শাসন করছেন। তাসবিহ হাতে বিচরণ করছেন কেউ কেউ। সবার নামও জানি না। তখন তো একদম নতুন। দূর থেকে দেখি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিই। সমীহ ও শ্রদ্ধা বুকের ভেতর। সঙ্গে ভয়। কী জানি- কোন্ ভুল হয়ে যায়! বেয়াদবি হয়ে যায়! উস্তাদের সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করা যাবে না। বেয়াদবি করা যাবে না কিতাবের সঙ্গে। কাগজের সঙ্গে। নূরিয়া মাদরাসার প্রথম সপ্তাহের সবক। হৃদয়ে দাগ কাটার মতো বসে গেছে।

কাগজের প্রতি বেয়াদবি করা যাবে না। এ ছিল হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ)-এর বিশেষ শিক্ষা। বয়ানে হাফেজ্জী হুজুর বলতেন। সে কথা আবার আমাদের হুজুররাও বলতেন। আলোচনায়, সবকে। হাফেজ্জী হুজুরের ছাত্রজীবনের ঘটনা। একদিন টয়লেট করতে গেলেন। দেখলেন কাগজের একটি টুকরো পড়ে আছে। একদম ময়লার মধ্যে। তিনি সেটা তুললেন। দেখলেন কাগজটিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা। আরবিতে। চমকে উঠলেন। হায়! এই কাগজ এই ময়লায়! সেই কাগজটি ধুইলেন। আতর লাগিয়ে যত্ন করে রেখে দিলেন। বয়ানে বলা হতো সুন্দর করে। এরপর হযরত হাফেজ্জী হুজুরের হৃদয়ের ভেতরে কুরআন শরীফ হেফজ করার পিপাসা জেগে ওঠে। এরপরেই তিনি পানিপথ সফর করেন। তার পরের ইতিহাস তো ইতিহাস। তাই তিনি কাগজের যেন অসম্মান না হয়- বলতেন বার বার। কাগজ যেন পায়ের নিচে না পড়ে। পথে চলতে চলতে তিনি থেমে যেতেন। টুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিতেন। একপাশে সরিয়ে রাখতেন। হেফাযত করতেন।

এ-জন্য আমাদেরও করতে হতো একটি কাজ। রোজ রোজ। কামরার সব ছাত্র সারিবেঁধে বসতো। গোসলের আগে। মাঠের দক্ষিণ দিকে। তারপর দ্রুত হেঁটে যেতে হতো উত্তর দিকে। যার সামনে যে কাগজ, কুড়িয়ে নিত। পাঁচ মিনিটে হাতের মুঠোয় কাগজের টুকরো। ভরে যেত অনেকের। সেই সব কাগজ রাখা হতো বস্তায়। নারিকেল গাছে ঝুলানো থাকতো বস্তা। সপ্তাহের শেষে পুড়ানো হতো। কাগজ কুড়ানো শেষে হতো গোসল। সে-ও দলবেঁধে। পুকুরের ঘাটলায়। বুড়িগঙ্গার তীরে। যার যেখানে ভালো লাগতো। কম সময়ে দলবদ্ধ গোসল। মিছিলের মতো। গোসলের উৎসব। আধা ঘণ্টা পর আবার সব ঠাণ্ডা। ঘণ্টা পড়ে গেছে। সবক শুরু। চারদিক ফাঁকা। সুনসান। কোথাও কেউ নেই। সবাই কামরার ভেতর। একই দৃশ্য মাগরিবের পর। মাদরাসা জুড়ে পড়া। হাজার হাজার শব্দের ভিড়। হাজার হাজার শব্দের ধ্বনি। হাজার হাজার শব্দের গুঞ্জরন। মৌমাছির সুরের মতো। সেই শব্দের গুঞ্জরনের মধ্যে মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতাম। সন্ধ্যা রাতে হঠাৎ কামরা থেকে বের হই। চুপচাপ একা। সবকটি কামরার দিকে দেখি। মনে হয়, অন্য এক জগত। পবিত্র পবিত্র। আলো আলো। অপার্থিব অপার্থিব। অচেনা অচেনা। যেন স্বপ্নে দেখা পুরনো কালের কোনো ছবি। ●

বিদেশে চাকুরী ভিসা

মালয়েশিয়া ❑
কাতার ❑
কুয়েত ❑
ওমান ❑
আরব আমিরাত ❑
সৌদি আরব ❑

ATAB
Association of Travel Agents of Bangladesh

Biman
Approved

আমাদের সেবা সমূহ

- ❑ হজ্ব ও ওমরাহ
- ❑ সকল দেশের বিমান টিকেট
- ❑ ছাত্র ভর্তি ভিসা
- ❑ ভিসা প্রসেসিং

মালয়েশিয়ার ওহরের ডিপ্লোমা কোর্সের স্টুডেন্ট ভিসা সল্প খরচে করা হয়

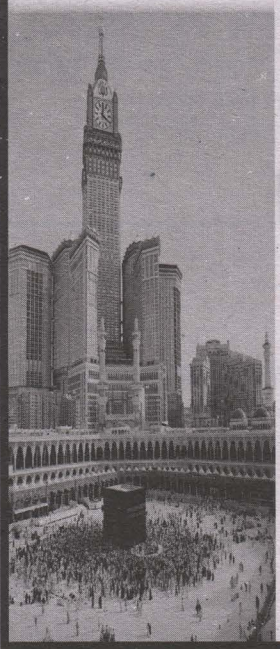

বিদেশে ছাত্র ভর্তি ভিসা

মালয়েশিয়া ❑ কানাডা
অষ্ট্রেলিয়া ❑ সাইপ্রাস
ফ্রান্স ❑ নিউজারল্যান্ড
ইতালি ❑ ইউ.কে
অস্ট্রিয়া ❑ রাশিয়া

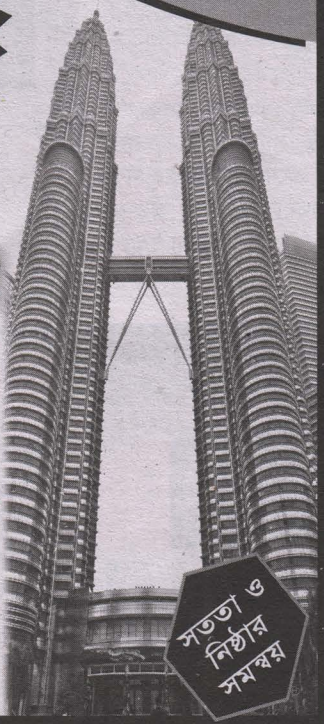

সততা ও নিষ্ঠার সমন্বয়

আল কারীম এয়ার ইন্টারন্যাশনাল

Al- Karim
Air International

সরকার অনুমোদিত ট্রাভল এজেন্সি

স্বত্ত্বাধিকারী: আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল করিম

পরিচালক: সানমুন ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেলস

বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরা এজেন্ট হজ্জ লাইসেন্স নং-১২৪৫

৬৫ ইসলাম টাওয়ার (৫ম তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

০১৯১৩২৬৫৩১৫, ০১৭১৬৮৮৭৪৩২

alkarimair@gmail.com

মাকতবাতুল আযহার প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক এক পূর্ণাঙ্গ সিরিজ

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি শাইখুল ইসলাম মুফতী তকী উসমানী দা.বা.-এর কালজয়ী সংকলন 'ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসাইল' বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মাকতাবাতুল আযহারের উদ্যোগে 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা' নামে অনূদিত হয়ে একসঙ্গে ৮ খণ্ডের সিরিজ আকারে প্রকাশিত হলো। আপন কর্মক্ষেত্রে সপ্রভিত একঝাক নিরলস অনুবাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে মানসম্মত দক্ষ অনুবাদের এই সিরিজটিতে আপনার জন্যে রয়েছে আধুনিক অর্থব্যবস্থার জানা-অজানা অসংখ্য তথ্য।

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [১]

ব্যবসা ও লেনদেনের ইসলামী বিধান

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'ব্যবসা ও লেনদেনের ফাযায়িল ও মাসায়িল, দুনিয়া ও ধন-সম্পদের হাকিকত, আধুনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন পেশা, জীবিকান্বেষণ, মাপে কম দেওয়া ও লেনদেনের স্বচ্ছতা বিষয়ক হৃদয়ছোঁয়া অমূল্য বয়ান।'

অনুবাদ করেছেন– মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

মুদ্রিত মূল্য : ২২০

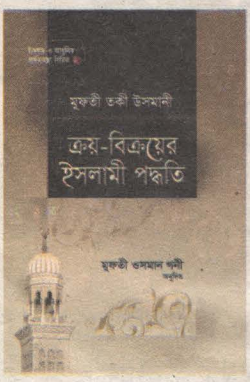

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [২]

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতি

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'বাকিতে বিক্রি, কিস্তিতে বিক্রি, স্বর্ণ, মুদ্রা, হুন্ডি, আড়ৎদারি, খেয়ার, আরায়া, মুসাররাৎ, তালাক্কী, ফুদূলী, টেন্ডার, নিলাম, ফটকা, প্রফিডেন্ট ফান্ড, দালালী, জা'আলা, বর্গা, হাওয়ালা, মুকাসামা ইত্যকার গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মাসায়েলের বিশদ বিবরণ।'

অনুবাদ করেছেন– মুফতী ওসমান গনী

মুদ্রিত মূল্য : ২০০

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়ের আধুনিক পদ্ধতি

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'শেয়ার, স্বত্ব, অধিকার বিক্রয়, ট্রেডমার্ক, লাইসেন্স, বন্ধক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, কাগুজে নোট, রপ্তানী, শিপমেন্ট, বিল ডিসকাউন্টিং, ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং, শুল্ক রেয়াত, বিনাবাক্যে বিক্রয়, হাউস ফাইন্যান্সিং, বীমা, তাকাফুল, লটারী ইত্যকার অসংখ্য সমকালীন মাসায়িলের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।'

অনুবাদ করেছেন–মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
উসতাযুল হাদীস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৪]

আধুনিক কিছু ব্যবসা ও তার শরয়ী বিধান

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'এলকোহল, জেলিটিন, স্প্রিট, আফিম, গাজা, মদ, ছবি, মূর্তি, প্রাণী বিক্রির কারবার, আমদানীকৃত গোশতের বিধান, অস্ত্র, মজুতদারি, ঠিকাদারি, প্রাইজবন্ড, বায়না, ক্রেডিট কার্ড, সমিতি, পেনশন বিক্রি, ফ্রি সার্ভিস, খেয়ারে মাগবূন সহ প্রচলিত কিছু কারবার প্রসঙ্গে দালিলিক আলোচনা।'

অনুবাদ করেছেন– মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

মুদ্রিত মূল্য : ১৬০

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৫]

ইসলামী ব্যাংকিং
পরিচয়, রূপরেখা ও প্রয়োজনীয়তা

অনুবাদ করেছেন– হাফেয মাওলানা মুফ্তি আসাদুজ্জামান

মুদ্রিত মূল্য : ৩২০

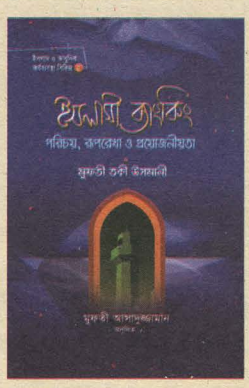

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও তার প্রতিকার

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'সুদী কারবারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও তার বিকল্প প্রস্তাব, সুদ নিষিদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, সুদের অনিষ্টতা সম্পর্কে পশ্চিমা গবেষক ও ব্যাংকারদের মন্তব্য, মুশারাকা সম্পর্কে কতিপয় আপত্তি, 'রিবা' সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ ও চল্লিশোর্ধ হাদীস, ব্যবসায়িক সুদ : ইসলাম ও বিবেকের দৃষ্টিতে, সুদহীন ব্যাংকি, সুদী ব্যাংকের সুদহীন শাখা সহ অসংখ্য অমূল্য বিশ্লেষণ।'

অনুবাদ করেছেন– মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক ও মুফতী ইমদাদুল ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য : ৩৪০

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৭]

পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'প্রচলিত আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জাস্টিস মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানীর জ্ঞানগর্ভ নিরীক্ষণ।'

অনুবাদ করেছেন– মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

মুদ্রিত মূল্য : ২২০

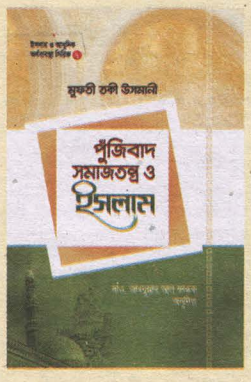

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ [৮]

ইসলামের ভূমিব্যবস্থাপনা

গ্রন্থটিতে রয়েছে, 'ভূমিমালিকানার সীমারেখা ও শরীয়াহ আপিলেট বেঞ্চের রায়, জমিনের অবৈধ জবরদখল, শুফ'আহ ও হক্কে শুফ'আহ, ভূমিহীনদের সহায়তার জন্যে ভূস্বামীদের ভূমি ক্রোক করা সহ অসংখ্য সমসাময়িক মাসায়িলের তথ্য-উপাত্তনির্ভর বিবরণ।'

অনুবাদ করেছেন– মাওলানা আবদল হালীম

মুদ্রিত মূল্য :

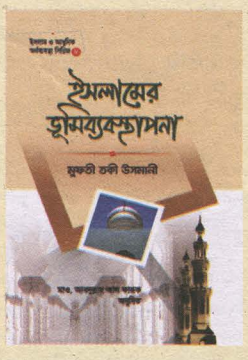

মাকতাবাতুল আযহার
maktabatulazhar@yahoo.com
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

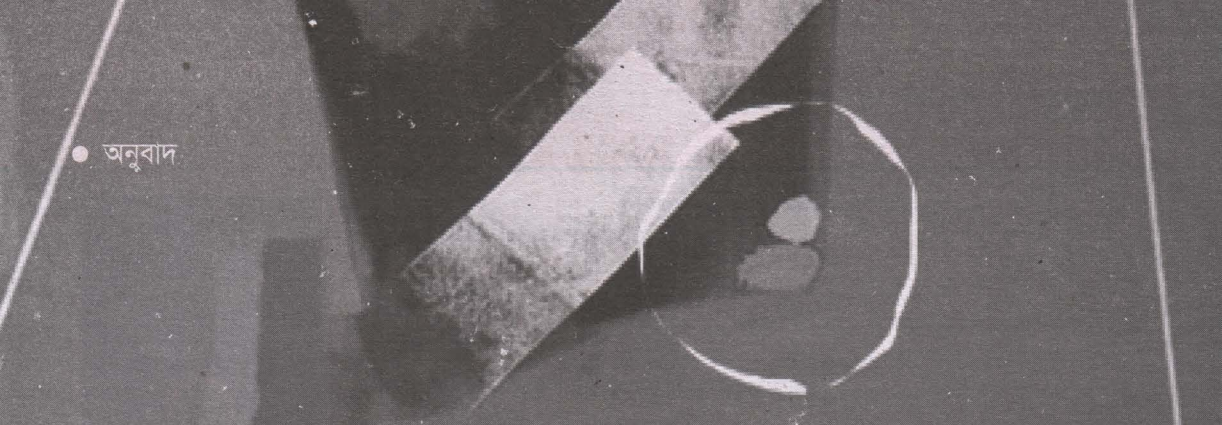

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠমানব

আবদুত তাওয়াব ইউসুফ
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারূক

ইবনে সিনা। মুসলিম ইতিহাসের এক অমর জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যিনি ছিলেন কিংবদন্তী। তাকে দিয়েই আমাদের আজকের গল্প-বলা শুরু করছি।

তিনি তখন অনেক সুপরিচিত মানুষ। চারদিকে তার অসাধারণ মেধা, পাণ্ডিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একদিন তার ঘরের এক তরুণ ভৃত্য তাকে এমন এক প্রশ্ন করে বসলো যে, তিনি চমকে ওঠলেন। হতচকিয়ে ওঠলেন। প্রশ্নটি শুনলে তুমিও বিস্মিত হবে। অবাক হয়ে দু'চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকবে। ইবনে সিনাও বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর। তবে উত্তরটি তিনি তখুনি দেননি। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এরপর অপেক্ষা করলেন উপযুক্ত সময়ের। কী ছিলো তার প্রশ্ন? তুমিও নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। সেদিন ভৃত্য তার মুনীব ইবনে সিনাকে প্রশ্ন করেছিলো—

'আপনি হলেন আপনার যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। বরং আপনি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। ধর্মবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিকিৎসা; সবশাস্ত্রেই তো আপনি সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী...

ভৃত্যের কথা শুনে ইবনে সিনা ধীরে ধীরে মাথা উপরের দিকে তুললেন। খুব ধীরে, বিনীত বিনম্রতায়। তিনি ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলেন—

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো?'

ভৃত্যটি খানিকক্ষণ থেমে নিলো। মনে মনে সে তার বক্তব্য গুছিয়ে নিলো। এরপর বলতে শুরু করলো—

'আপনি অতীতের সমস্ত মনীষীদের ছাড়িয়ে গেছেন। অতীতের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীদের ছাড়িয়ে গেছেন। এমনকি আপনি নবীদের....

কথার এ পর্যায়ে ইবনে সিনা ভৃত্যকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। বললেন, 'চুপ করো।'

কিন্তু তরুণ ভৃত্য থামলো না। সে বলেই চলেছে–

'আপনি আমাকে বলুন, মুহাম্মাদ সা. কীসের ভিত্তিতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? কোন গুণে তিনি আপনাকে ছাড়িয়ে যাবেন?'

ইবনে সিনা অনুভব করলেন, তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তিনি চুপ করে রইলেন। একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি ভাবলেন, এখন এর উত্তর দেয়া সমীচিন (ঠিক) হবে না। ভৃত্যটি যদিও প্রশ্নের ধরন বদলেছে। তবুও তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোক্ষম সময়ে এবং বুদ্ধিদীপ্ত করে। মুহাম্মাদ সা. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। তিনি সর্বকালের সর্বযুগের গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের সেরা মানুষ।

আর তাই তার কথার তাৎক্ষণিক উত্তর না দিয়ে ইবনে সিনা দাঁড়িয়ে গেল্লেন। প্রথমে তিনি ইশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এরপর অন্য দিনের চেয়ে খানিকটা আগে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকার রাত। বাইরে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ বইছে। নিশ্চুপ প্রকৃতি। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সবাই। শীতের রাতগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ হয়। একসময় সেই দীর্ঘ রাত্রিও ফুরাতে শুরু করলো। বেশিক্ষণ বাকি নেই। আর ঘণ্টাখানেক পরেই ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসবে।

ইবনে সিনার ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি ধীরে ধীরে দু'চোখের পাতা মেললেন। ভৃত্যটি তখনও তার বিছানায় গুটি-শুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে। লেপের উষ্ণতার প্রতিটি বিন্দু সে যেন উপভোগ করছে। ইবনে সিনা ভৃত্যকে ডেকে বললেন—

'আমার জন্যে একটু অযূর পানি গরম করো।'

আড়মোড়া ভেঙে ভৃত্যটি সোজা হলো। মাথার ওপর

থেকে লেপ সরাতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে আরামের উষ্ণতা ভেঙে দিলো। প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে দ্রুত সে লেপের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিলো। বললো, 'বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর কিছুক্ষণ পর ওঠছি।' জড়তার কারণে তার কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাচ্ছিলো।

এতোক্ষণ ভৃত্যটি ইবনে সিনার দিকে ফিরে ঘুমাচ্ছিলো। এবার সে দেয়ালের দিকে ফিরে হাঁটু ভাজ করে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেলো গভীর ঘুমের আবেশে।

নিস্তব্ধ রাতের কেটে গেলো আরো কয়েকটি মুহূর্ত। কিছুক্ষণ পর ইবনে সিনা দ্বিতীয়বার ভৃত্যকে ডাকলেন। বললেন—

'বৎস, ওঠো। আমি নামায পড়বো। আমার জন্যে পানি গরম করে নিয়ে এসো'।

এবার আর ভৃত্য লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করলো না। মাথা ভেতরে রেখেই বললো, 'এখনো ফজরের আযান হয়নি। আমাকে আরেকটু ঘুমুতে হবে'।

শায়খ বিরক্ত হলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না। তিনি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাইরের অন্ধকার হালকা হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুয়ায্যিন ডেকে ওঠবেন।

ইবনে সিনা তখন তৃতীয়বারের মতো ভৃত্যটিকে ডাকলেন। এবারও তিনি পানি গরম করতে বললেন। কিন্তু যথারীতি ভৃত্য নিজেকে লেপের উষ্ণতার আবেশে জড়িয়ে রাখলো। পরিশ্রম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রচণ্ড শৈত্যের অনুযোগ করলো। তার মুখের অস্ফুট শব্দগুলো তখন প্রকৃতির শব্দহীন নিরবতায় খানিকটা বেসুরো শোনাচ্ছিলো।

এভাবে কেটে গেলো আরো কয়েকটি মুহূর্ত। মসজিদের মিনার হতে ভেসে এলো আযানের সুমধুর ধ্বনি। মুয়ায্যিন বলছেন—

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ]

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ]

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই]

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল]

শায়খ ইবনে সিনা তখন ভৃত্যের কাছে এলেন। তার মুখের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে দিলেন। ভৃত্যটি তখন যেনো সম্বিত ফিরে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ালো। শায়খ তার কাঁধে মৃদু ঝাকুনি দিয়ে বললেন—

'তুমি কি মুয়ায্যিনের আযান শুনতে পাচ্ছো?'

: জ্বি, মুনীব। আমি আলবৎ শুনতে পাচ্ছি।

'মুয়ায্যিন কি মুহাম্মাদ সা.-কে দেখেছেন?'

: জ্বি না, সে তো তাঁকে কখনই দেখেনি।

'মুহাম্মাদ সা. ও এই মুয়ায্যিনের মাঝে কত বছরের পার্থক্য?'

: অনেক বছর, হাজার বছরেরও বেশি।

'মুহাম্মাদ সা.-এর জন্মভূমি থেকে এই লোকটি কত দূরে অবস্থান করছেন?'

: জ্বি মুনীব, আমার অনুমানে পথের দূরত্ব হাজার মাইল হতেও বেশি হবে।

অনেকগুলো প্রশ্ন করে শায়খ কিছুক্ষণ থামলেন। একটু অবকাশ দিলেন। ভৃত্যকে ভাবার সময় দিলেন। প্রচণ্ড বিস্ময়ে ভৃত্যটি যেনো দু'চোখে শর্ষেফুল দেখছে। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটছেই না। বড় বড় চোখে মুনীবের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটি খোলাসা করে ইবনে সিনা বললেন—

'দেখো, এতো কিছুর পরও ওই মুয়ায্যিন প্রচণ্ড শীতের ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। লোকালয়ের সবথেকে উঁচু স্থানে ওঠেছে। দু'কানে আঙ্গুল রেখে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে সে মুহাম্মাদ সা.-এর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে।

আর তুমি? তুমি তো আমাকে খুব ভালো করে চেনো ও জানো। বড় গলায় কাল রাতে বলেছিলে, আমি নাকি পৃথিবীর সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অথচ সেই তুমি এখন আমার জন্যে সামান্য বিছানা ত্যাগ করতে চাইছো না।

আমি তোমাকে তিন তিনবার ডেকেছি। তোমাকে একটু কষ্ট করতে বলেছি। কিন্তু তুমি আমার কথা কানে তোলোনি। তুমি কি এখন বুঝতে পেরেছো, মুহাম্মাদ সা. কেনো পৃথিবীর সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ?'

পৃথিবীর নানাপ্রান্তে রয়েছে অসংখ্য মসজিদ। সেখানে প্রত্যহ পাঁচবার জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হয়। প্রতিবার নামাযের পূর্বে মুয়ায্যিনগণ মুহাম্মাদ সা.-এর নাম উচ্চারণ করেন। তাঁরা কণ্ঠের সবটুকু শক্তি, সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে ঘোষণা করেন, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। আমরাও তাঁদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর আযানের শব্দগুলো আবৃত্তি করি।

শুধু কি তাই? আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ... এভাবে আমরা তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করি শতবার, সহস্রবার, অসংখ্যবার।

আমরা আমাদের অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি শ্রেষ্ঠমানব। তিনি শ্রেষ্ঠপুরুষ। তিনি ছিলেন সর্বাধিক খোদাভীরু। তিনি ছিলেন সর্বাধিক খোদাপ্রিয়। তিনি ছিলেন খোদার প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ●

MADANI KUTUBKHANA
madanikbd@gmail.com

المكتبة المدنية
মাদানী কুতুবখানা

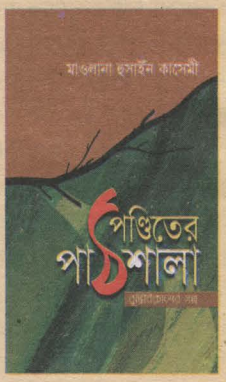

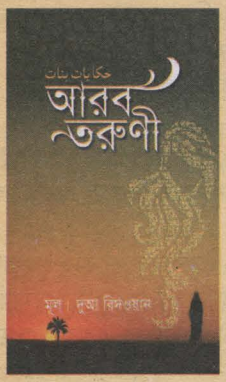

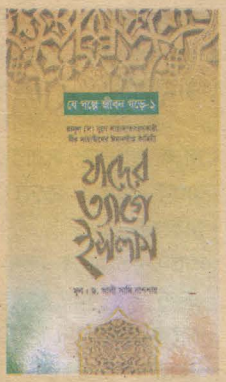

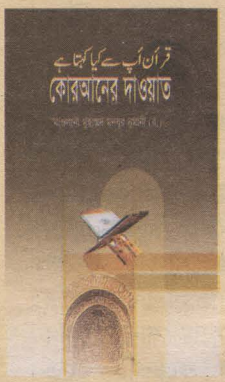

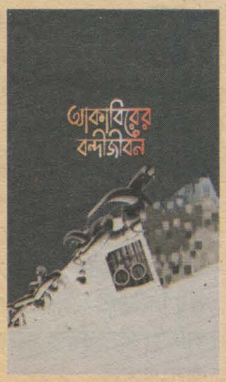

সৌদিআরব, মিসর ও বৈরুত হতে সদ্য আমদানিকৃত সর্বাধিক কিতাব আমাদের বিক্রয় কেন্দ্রে

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি | শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ | শায়খ তানতাবি | আল্লামা ইবনে তাইমিয়া শায়খ ড. শুয়াইব আরনাওত | ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি শায়খ ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহসহ মাশায়েখ আরব ও আজম-এর গ্রন্থাদির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

দারুল ইফতা, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা লাইব্রেরির জন্য **বিশেষ ছাড়!**

কুরিয়ার ও ভিপিযোগেও কিতাব পাঠানো হয়

হটলাইন : ০২-৯৫৩৩১৬১, ০১৭ ৩৩ ২০ ৬৭ ৫৭

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রধান কার্যালয়
৩১, ৩২ পিকে রায় রোড, ইস্পাহানি বিল্ডিং [৩য় তলা]
বাংলাবাজার, ঢাকা

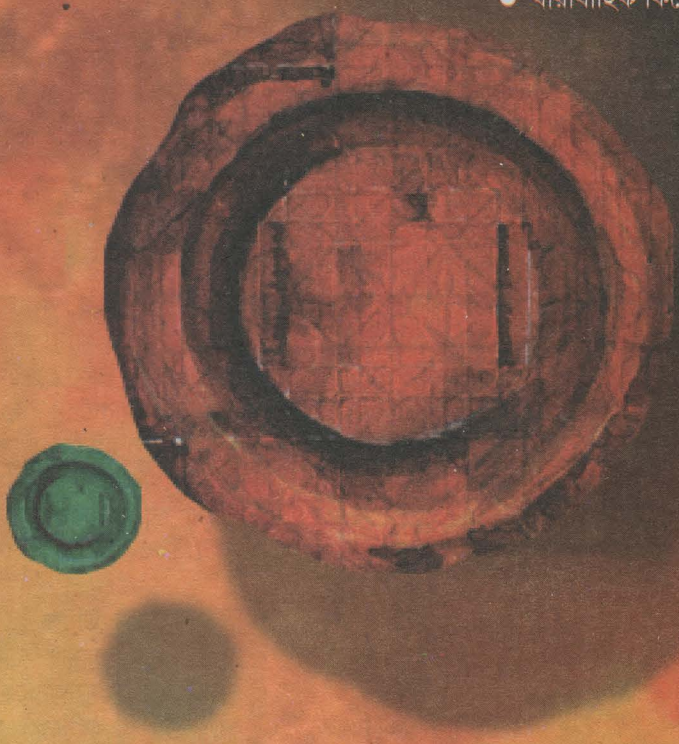

প্রিয় জিনিস
প্রিয় দান

আবদুল্লাহ তানতাভী
ভাষান্তর : আবু গালিব

ষোল.

মুসআব কিছুক্ষণের মধ্যেই আলীকে বন্ধু বানিয়ে ফেললো। দু'জনে কতো কথা। পড়াশুনা ও মাদরাসা নিয়েই বেশি কথা হচ্ছিলো। আলী শুনছিলো বেশি বলছিলো কম। আবু আলী চাচাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখছিলেন ওদেরকে। অমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সাধারণ এক মালি'র ছেলের হাত ধরে মুসআব হাঁটবে এ বাগানে— আবু আলী ভাবতেই পারে নি! দূর থেকে মনে হচ্ছে যেনো ওরা দুই ভাই। মুসআবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় সম্মানে ভালোবাসায় ভরে উঠলো সাধারণ মালি চাচার নির্ভেজাল মন। কতোদিন ধরে আবু আলী এদের বাগানে মালির কাজ করে, কিন্তু একদিনের জন্যেও মনে হয় নি, সে এখানে নিছক ভেতনভোগী একজন অজানা অচেনা মালি। বরং সব সময় মনে হয়েছে সে যেনো নিজের বাড়ির নিজের বাগানেরই পরিচর্যা করছে। মানুষ এতো ভালো ও অমায়িক এবং এতো আপন ও নিরহঙ্কার হয় কেমনে! আবু আলীর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। আবার তাকালো সে মুসআব ও আলীর দিকে। চোখে পানি। মুখে হাসি।

সতের.

এদিকে ঘটলো আরেক ঘটনা। ফুয়াদ তখনো ঘুমোচ্ছিলো। ওর জানালায় এসে বসলো একটা চড়ুই। জানালার গ্লাস দিয়ে যেনো ঘুমন্ত ফুয়াদকে একটু দেখে নিলো। তারপর জানালার গ্লাসে

ঠোকর দিলো। একবার। দুইবার। বারবার। থামতেই চাইছে না। সেই সাথে আছে কিচিরমিচির। এভাবে চড়ুইটা ঘুমটা ভেঙেই দিলো ফুয়াদের। ফুয়াদ ঘুম-ঘুম চোখে জানালায় তাকাতেই দেখে একটা চড়ুই জানালার গ্লাসে অবিরাম ঠোকরাচ্ছে আর জোরে জোরে কিচিরমিচির করছে। এত্তো আরামের ঘুমটা তাহলে এই চড়ুইটাই ভেঙেছে! বিরক্ত হলো ফুয়াদ। কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে আবার শোয়ার চেষ্টা করলো ফুয়াদ। কিন্তু না, পাখিটা থামছে না। ওর কিচিরমিচিরটা কানে এসে বিঁধছে। ঠোকরানোর শব্দটা আরো অসহ্য লাগছে। পাখিটা যেনো বলছে, আমি তোমাকে ঘুমোতে দেবো না, দেবোই না! সরাও কম্বল! ওঠো জলদি! কটকট! কিচিরমিচিররর!!

ফুয়াদ কম্বলটা সরিয়ে তাকালো কটমট করে ক্ষুদে পাখিটার দিকে। নাহ! ভয় পাচ্ছে না। কী করা তাহলে? একটা লাফ দিয়ে ছুটে গেলো ফুয়াদ জানালার দিকে। ফুড়ুৎ করে চড়ুইটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলো। ফুয়াদ বিজয়ীর ভঙ্গিতে আবার শয্যা গ্রহণ করলো। কিন্তু চড়ুইটা আবার 'সদর্পে' ফিরে এলো এবং আগের মতো গ্লাস ঠুকরাতে শুরু করলো। সাথে কিচিরমিচিরের 'সকাল সঙ্গীত' গাইতে লাগলো আরো জোরে জোরে। কিচিরমিরের 'সকাল সঙ্গীত' না বলে বলা উচিত 'ঘুম ভাঙানিয়া গান'। এবার আর ফুয়াদ ক্ষেপলো না। রাগ করলো না। উঠে গিয়ে পাখিটিকে— 'এই যা!'ও বললো না। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো শুধু, চড়ুইটার দিকে। কেনো অমন করছে চড়ুইটা? ফুয়াদ আপন মনে বলে উঠলো : 'এই চড়ুই! অমন করছো যে! আমি শুয়ে থাকলে তোমার কী অমন ক্ষতি হয়ে যাবে? তুমি রাজা? রাজ্য চলে যাবে?! বাব্বা! কী ঠোকর! গ্লাস ভেঙে ফেলবে! আশ্চর্য! কে তোমাকে পাঠালো?!

আঠার.

শেষ পর্যন্ত ফুয়াদকে উঠতেই হলো। আশ্চর্য! জানালার কাছে এসে দেখে চড়ুইটা নেই! কোথায় গেলো মুহূর্তে! মালি চাচা'র উপর চোখ পড়লো ফুয়াদের। বাগানে কাজ করছে। ফুয়াদ আরো দেখলো, মুসআবের সাথে একটা ছেলে কী সুন্দর হাঁটছে আর হাসতে হাসতে গল্প করছে! আজব তো! কে ও? কী কথা বলছে ওরা? ফুয়াদ উৎকর্ণ হলো। হ্যাঁ, এই তো শোনা যাচ্ছে মুসআবের কথা। মুসআব বেশ জোরে এবং স্পষ্ট আওয়াজে কথা বলে। মুসআব বলছিলো :

-আলী! আমার ভাই ফুয়াদের কথা মনে হয় চাচা'র কাছে শুনেছো। আমাদের মতোই বয়স। খুব ভালো ছেলে। তোমার সাথে পরিচয় হলে খুব ভালো লাগবে। ও-ও খুব খুশি হবে।

একটু পরই মালি চাচা'র আওয়াজ শোনা গেলো :

-আলী! একটু আসবে বাবা! আমাকে একটু সাহায্য কর! বাগানে আজ অনেক কাজ!

মুসআবের সম্মতির অপেক্ষা না করেই আলী ছুটে গেলো বাবা'র কাছে। বললো :

-বাবা! এই যে আমি! আমি এতোক্ষণ মুসআব ভাইয়ার সাথে কথা বলছিলাম। অনেক কথা! অনেক ভালো লাগলো!

-হ্যাঁ .. তারা সবাই খুব ভালো মানুষ!

ফুয়াদ অদূরে বসে সবই শুনছিলো। তার বুঝতে কষ্ট হলো না যে, এ মালি চাচার ছেলে। বেশ তো ছেলেটা! কিন্তু পরনের জামা কাপড়ের কী জীর্ণদশা!

উনিশ.

ফুয়াদ বারান্দায় বসে আছে। মুসআবকে দেখছে। আলীকে দেখছে। আলীর জীর্ণ পোশাক দেখছে। আবার চড়ুইটাকে খুঁজলো ফুয়াদ। ক্ষুদে পাখিটির প্রতি এখন ফুয়াদের এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ জন্ম নিলো। ঘুমটা না-ভাঙালে এই সুন্দর শিশিরে-পরিবেশটা ফুয়াদ দেখতে পারতো না। অসংখ্য পাখির কূজন শুনতে পারতো না। আলীকেও হয়তো দেখতে পারতো না। মুসআব বুঝি প্রতিদিনই বাগানে আলীর সাথে অমন গল্প করে!

ফুয়াদের মনে একটা শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো আজকের মিষ্টি সকালটা। অদ্ভুত একটা ভালোলাগা কাজ করছে ফুয়াদের ভেতরে। ইস! আরো আগে যদি ভাইয়ার মতো ভোরে ওঠার অভ্যাস করতো ফুয়াদ!

আবার তাকালো ফুয়াদ আলীর পোশাকের দিকে। ওর দৃষ্টি ছলছল করে উঠলো। কী ভালো ছেলের এ-কী জীর্ণ জামা! ফুয়াদ আপন মনে ভাবতে লাগলো : আচ্ছা ওকে আমার কিছু পুরোনো কাপড় তো দিতে পারি! পারি তো! কেনো পারবো না? আমি তো সে-সব পরিই না। আলীকে বেশ মানাবে। আমার সমান উঁচু লম্বা। কিন্তু...! নাহ! পুরোনো কাপড় দিতে যাবো কেনো? কাল রাতেই-না মুসআবকে বলছিলাম 'হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন!' বরং ভালো জামাটাই আমি আজ ওকে দিয়ে দেবো! কাল আম্মু এনেছে! এখনো আমার পরাই হয় নি!

ফুয়াদ ভেতরে গোলো। ওয়ারড্রব খুললো। নতুন

জামার সেটটা নিলো। নাইলনের একটা ব্যাগ খুঁজতে লাগলো। মা ততোক্ষণে জেগে উঠেছেন। বললেন :

-ফুয়াদ! কী খুঁজছো!

-মা! আমার একটা সুন্দর ব্যাগ লাগবে!

-কিন্তু তুমি এতো সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়লে?! তুমি তো অনেক পরে ওঠো শুক্রবারে!

-মা! তোমার কাছে কোনো সুন্দর ব্যাগ আছে নাইলনের?

মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন :

-ব্যাগ দিয়ে কী করবে!

-আমি ব্যাগটায় মুড়িয়ে একজনকে একটা উপহার দেবো!

-কাকে? এই সাত সকালে?!

-আলীকে মা! মালি চাচার ছেলে!

-তুমি ওকে চেনো?!

-আজই প্রথম দেখলাম! ও মালি চাচার সাথে কাজ করছে!

-কী উপহার দিতে চাইছো!

-আমার গ্রীষ্মকালীন ওয়েটস্যুটটা, যা গতকাল তুমি কিনে এনেছো!

ছেলের কথা শুনে মা'র চোখ থেকে ঘুমের শেষ চিহ্নটুকুও উড়ে গেলো! অবাক চোখে কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে অনেকটা ধমকের সুরেই বললেন :

-বলো কি তুমি! তোমার এ পোশাকটা মার্কেটে খুঁজতে খুঁজতে আমার মাথাব্যথা হয়ে গেছে, আর তুমি সেটা মালি'র ছেলেকে দিয়ে দেবে!!

-হ্যাঁ, আমি এটিই ওকে দেবো! আমার তো কতো আছে, ওর জামাটা তো ছেঁড়া মা!

-না! এটা দেবে না! দিতে চাইলে পুরোনো কানো কাপড় দাও!

তখনই শোনা গেলো বাইরে থেকে মুসআবের কণ্ঠ :

-না মা! 'হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন!' প্রিয় জিনিস .. প্রিয় দান!

মা মুসআবের কথা কানেই তুললেন না। বরং ওর দিকে তাকিয়ে বললেন :

-মুসআব শোনো! তোমার ভাইয়ের মাথা ঠিক নেই, কী বলছে দেখো! ও নাকি নতুন ওয়েটস্যুটটা দান করে দেবে মালি'র ছেলেটাকে!

মুসআব বললো :

-মা! আমি তোমাদের কথা শুনেছি! আলী দেবেই আর তুমি দেবেই না! এই তো? আচ্ছা, আমি একটা সুন্দর সমাধান বলে দিই! দেবো?

-কী সমাধান মুসআব! জলদি বলো!

-ফুয়াদের স্যুট ফুয়াদের কাছেই থাক! ওর বদলে আমিই দেবো আলীকে! ঠিক আছে মা!

কিন্তু মা কিছু বলার আগেই ফুয়াদ কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো :

-ভাইয়া তুমি আমার সিদ্ধান্তটা নষ্ট করে দেবে না! তুমি না— আমিই দেবো আলীকে!

মা এবার বললেন মুসআবকে কিছুটা বিরক্তিভরা কণ্ঠে :

-তুমি কী দেবে শুনি!

-আমার ওয়েটস্যুটটা!

-অসম্ভব! আমি এ পোশাক দান করার অনুমতি তোমাদের কাউকেই দেবো না!

-কেনো মা! মুসআবের কণ্ঠে কাতরতা।

-অনেক দামী জিনিস! অনেক প্রিয় জিনিস! অনেক কষ্ট করে কিনে এনেছি! প্যারিসের তৈরী! তা ছাড়া তোমরা ছাড়া আর কারো গায়ে এ স্যুট মানাবে না!

ফুয়াদ আড় চোখে তাকালো মুসআবের দিকে। বললো :

-ঠিক আছে মা। আমি তাহলে আমারটা আর দিচ্ছি না। বরং ভাইয়াই দেবে। তবে আমার ইতালিয়ান জুতো জোড়া আর আমেরিকান পোশাকটা কিন্তু দেবোই!

বিশ.

বাবা শুনতে পেলেন স্ত্রী'র হাহাকারময় চিৎকার! ঘুম ভেঙে গেলো তারও। কী হচ্ছে মা ছেলেদের মাঝে! এতো কথা কিসের! কাছে এগিয়ে এলেন বাবা। সব জেনে ছেলেদেরকে বললেন :

-মায়ের কথা শোনো!

ফুয়াদ বললো :

-বাবা! আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই!

-বলো!

কিন্তু ফুয়াদ প্রশ্ন করার আগে মায়ের দিকে তাকালো। বললো :

-মা! আমি এখন প্রশ্নটা করতে চাই! শর্ত হলো, তুমি রাগ করতে পারবে না! বিরক্ত হতে পারবে না!

মা ততোক্ষণে অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছেন। বললেন :

-আচ্ছা বলো! রাগও করবো না বিরক্তও হবো না!

ফুয়াদ বলা শুরু করলো :

-মা! মনে করো, নানা এবং নানি মিলে তোমাকে কিছু করতে বললো কিন্তু আব্বু তোমাকে নিষেধ করলো, তুমি কার কথা শুনবে?!

-তোমার নানা-নানি'র কথা শুনবো!

ফুয়াদ এবার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললো :

-আচ্ছা ঠিক আছে। এবার শোনো তাহলে আসল

প্রশ্নটা :
-তোমার আব্বু-আম্মু অর্থাৎ নানা-নানি কিছু করতে বললো অপরদিকে আল্লাহ বললেন অন্য কথা, কার কথা শুনবে মা?!!
মা বললেন (ছেলের 'ফাঁদে' পড়ে) :
-আল্লাহর কথা শুনবো!
এবার বাবাও মায়ের মতন বললেন :
-অবশ্যই আল্লাহর কথা শুনতে হবে! তারপর ... আচ্ছা ফুয়াদ তোমার আর কোনো প্রশ্ন আছে?
ফুয়াদ এবার ভাইকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো :
-মুসআব জলদি বলো দান সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন!
মুসআব সঙ্গে সঙ্গে মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করলো : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম। লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন। কিছুতেই তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না করলে!
ফুয়াদ বললো :
-সাদাক্বাল্লাহুল আযিম! সত্য বলেছেন মহান আল্লাহ! আমি আমার ওয়েটস্যুটটা মালি চাচার ছেলে আলীকে দান করবো! কেননা এটি আমার প্রিয় জিনিস!
মুসআব বললো :
-না ফুয়াদ! আমি দান করবো আমার ওয়েটস্যুটটা ওকে! আর তুমি দেবে ওই যে বলেছিলে— সেই জামাটা ও জুতো জোড়া! তাহলে আমরা সবাই পুণ্য পেয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ! বাবাও পাবেন পুণ্য। কেননা তিনি মূল্য পরিশোধ করেছেন নিজের টাকায়! আম্মুও পাবেন পুণ্যের অংশ। কেননা তিনি কষ্ট করে কিনে এনেছেন আমাদের জন্যে! আর

বাবা! একটু আগে তুমি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছো, তুমি আল্লাহর কথাই শুনবে! তাহলে এখন থেকে যাকাত দিতে হবে! নামাযও পড়তে হবে! নামায পড়া আল্লাহর হুকুম! যাকাত দেয়াও আল্লাহর হুকুম! বাবা আজ আর রেগে উঠলেন না। একটু বিরক্তও হলেন না। তার চেহারায় ফুটে উঠলো আশ্চর্য এক আনন্দ-আভা!

আমরাও পাবো নেকি। কেননা আমরা একটি দরিদ্র ছেলের জন্যে আমাদের ভালোবাসার দু'টি পোশাকের মায়া ত্যাগ করছি! ঠিক বলছি ফুয়াদ?!
-ঠিক আছে ভাইয়া! তুমি দেবে তোমার ওয়েটস্যুটটা আর আমি দেবো ইটালিয়ান জুতো জোড়া ও আমেরিকার পোশাকটা!
মুসআব তৃপ্তিভরে হাসলো। বাবা'র চোখে চোখ রেখে বললো :
-বাবা! একটু আগে তুমি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছো, তুমি আল্লাহর কথাই শুনবে! তাহলে এখন থেকে যাকাত দিতে হবে! নামাযও পড়তে হবে! নামায পড়া আল্লাহর হুকুম! যাকাত দেয়াও আল্লাহর হুকুম! বাবা আজ আর রেগে উঠলেন না। একটু বিরক্তও হলেন না। তার চেহারায় ফুটে উঠলো আশ্চর্য এক আনন্দ-আভা! মুগ্ধতা-রেখা!! তিনি কিছু বলতে যাবেন অমনি মা চোখের পানি মুছতে মুছতে মুখে অদ্ভুত তৃপ্তিময় অনাবিল হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে উঠলেন :
-আমি যাকাত দেবো! কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে!
-প্রতি বছর?!
-প্রতি বছর, ইনশা আল্লাহ!
সবাই একসঙ্গে হঠাৎ পেছনে তাকালো। সাত বছরের বোন হিবা আসছে চোখ কচলাতে কচলাতে। এইমাত্র ওর ঘুম ভেঙেছে। মা এগিয়ে গিয়ে ওকে আদর করে নিয়ে এলেন।

মুসআব তাকালো আবার বাবার মুখের দিকে। বাবাও মায়ের মতো ছলোছলো দৃষ্টি নিয়ে হাসছেন শিশুর হাসি। তৃপ্তির হাসি। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন :
-আমি বুঝি 'না' বলবো! হতেই পারে না! আমি তোমাদেরকে একলা 'ভালো' হতে দেবো না! এ বছর থেকে আমিও দেবো যাকাত! পড়বো নামায!

একুশ.

একটু পর বাবা মা'র উপস্থিতিতে মুসআব ও ফুয়াদ আলী'র হাতে তুলে দিলো নিজেদের উপহার। আলী অবাক! মালি চাচাও অবাক! বাবা-মা আর দু'ভাইয়ের মুখে হাসি— দানের মহিমায় ভাস্বর সে হাসি! কিন্তু মালি চাচা কাঁদছেন! আলীর চোখেও পানি! খুশির কান্না! তৃপ্তির হাসি! এদিকে হঠাৎ ফুয়াদের চোখেও দরদর করে অশ্রু নেমে এলো! ওই জানালাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফুয়াদ কাঁদছে! কেউ জানতে পারলো না এ কান্নার রহস্য কী! কে এখন বলে দেবে সবাইকে— এ কান্না নতুন জীবনের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর চড়ুই পাখির জন্যে! ●

সমাপ্ত

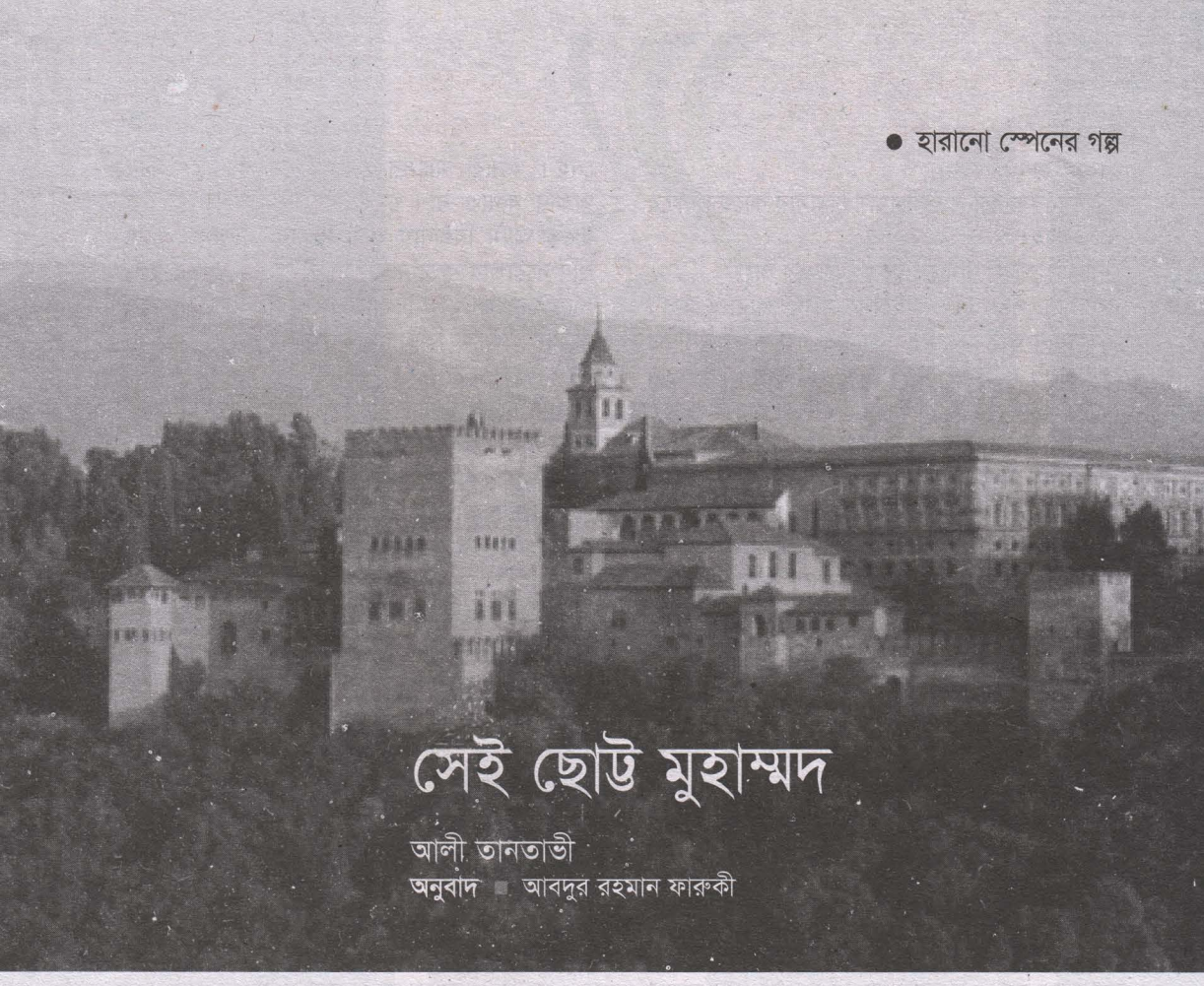

সেই ছোট্ট মুহাম্মদ

আলী তানতাভী
অনুবাদ ■ আবদুর রহমান ফারুকী

[গত সংখ্যার পর]

এরপর থেকে যখনই গ্রানাডার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা মিনারগুলো দেখতাম, আমার ভিতরে এক ধরনের বিষণ্নতা, আকৃষ্টতা, ঘৃণা, ভালোবাসা একসাথে কাজ করতো। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে দীর্ঘ সময় ধরে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকতাম। হুশ ফিরে পেতেই মসজিদের চারপাশে ঘুরতাম, একদিন তো সম্বোধন করে বলেই ফেললাম— হে...! তুমি ভুলে গেছো তাদের কথা, যারা জীবন বিলিয়ে তোমাকে গড়ে তুলেছেন?! শরীরের তাজা রক্ত ঢেলে ঢেলে রক্ষে করেছেন?! আর সেই 'তুমি' কি না তাদের অর্পিত দায়িত্ব ভুলতে বসেছো! তাদের ভালোবাসা অস্বীকার করছো! তুমি জানো! এরা ছিলেন এমন মহান, মুখ দিয়ে কিছু একটা বললে, পুরো দুনিয়া কান পেতে শুনতো। তারা কোনো আদেশ করলে এই আকাশ-বাতাস তা যথাযথ পালন করত!। তোমরা কী! আমার বুঝে আসছে না! আচ্ছা তোমরা এতো দ্রুত সব দলবেঁধে কাপুরুষ হয়ে গেলে?! তোমাদের কি আযানের পরিবর্তে খৃষ্টানদের ঘণ্টাধ্বনি শুনতেই এখন বেশি ভালো লাগে! ইমামদের বাদ দিয়ে পোপদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেই মজা লাগে?!

আমি এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে এ-সব ভাবতে পারতাম না। ভীষণ ভয় লাগতো। ভাবতাম এই বুঝি শুনে ফেলেছে আমার কল্পনা ও অনুচ্চারিত ভাবনাগুলো গোপন দেয়ালের কোনো গোপন কান! ভয়ে চলে আসতাম।

***

আব্বু প্রতিদিন ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু বিধান আমাকে শেখাতেন। আরবী বর্ণমালাগুলো কাগজে লিখে বলতেন— এ গুলো আমাদের বর্ণমালা। এরপর আস্তে— আস্তে— আরবীতে লিখতে ও বলতে পারা শিখে ফেললাম। কুরআন তিলাওয়াত, অজু, নামাযসহ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানও শিখে ফেললাম। আমরা সেই গোপন কুঠুরীতে গোপনে নামায পড়তাম। আব্বুর ভয় ছিলো একটাই— 'আমি এ সব কারো কাছে বলে না বসি। সব সময় আমাকে সতর্ক করতেন। আমাকে আগলে রাখতেন। একদিন তো পরীক্ষা স্বরূপ আম্মুকেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে এখানে এই গোপন কুঠুরীতে! আম্মু এসে বললেন :

-আচ্ছা! তোমার আব্বু কী শিখায় তোমাকে!

-মানে! কই কিছু না তো! (আমি আকাশ থেকে

পড়ার ভান করতাম)
-আমি কিন্তু জানি! কী শিখায়? আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই!
-না মা! আব্বু আমাকে কিছুই শিখায় না!
কিছুদিন পর এক ভাইয়ের সাথে পরিচয় হল। মুসলমান ভাই। আমরা তিনজন এক সাথে ইবাদত করতাম। কুরআন তিলাওয়াত করতাম। কিন্তু এর মাঝে খৃষ্টানদের তল্লাশি বেড়ে গেলো। ওরা সন্দেহ হলেই হানা দিতো। যখন তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানেই। গ্রানাডায় হাতে গোনা যে কয়জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলো তাদের কেউ কেউ ধরা পড়ে গেলো। ধরা পড়া মানেই শাস্তি! মৃত্যু! অথবা খৃষ্টান হয়ে যাওয়া!! আল্লাহপানা! স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম রাস্তায় পড়ে আছে রক্তলাল নিরীহ লাশ। তাকালেই বোঝা যেতো কী নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে এদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

***

একদিন আব্বু সেই গোপন কামরায় আবার আমাকে নিয়ে বসলেন রাতের আঁধারে। অনেকক্ষণ নীরবতায় কেটে যাওয়ার পর বললেন :
-কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে সময় আমার ঘনিয়ে এসেছে। আর এদের হাতেই শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই আমি। এর বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকে জান্নাত দেবেন। আর শোনো, এই যে আমি তোমাকে অন্ধকার জগত থেকে বের করে আনতে পারলাম অনেকদিন পরে হলেও, এ-ই আমার সান্ত্বনা। যেদিন শুনবে আমার কিছু হয়েছে, তখন আর দেরি করবে না! তোমার চাচা যা বলবেন তাই করবে সঙ্গে সঙ্গে।
আমি সারারাত একটুও ঘুমোতে পারি নি। কেবলই কেঁদেছি। আব্বুর কথাগুলো আমাকে শুধু কাঁদাচ্ছিলো! সত্যি কি আব্বুর উপর নেমে আসতে পারে কোনো কালো বিপদ?

এভাবে কাটতো লাগলো সময়। আগের মতো এখন আর হাসতে পারি না। আমি আব্বু আম্মু সবাই সঙ্কায়। কোনদিন যেনো ওরা এসে আমাদের বাড়িতে হানা দেয়। আব্বুকে নিয়ে যায়। প্রায় দুই মাস পর। শেষ রাত। অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। আরবী মাসের শেষ দিকে আকাশে চাঁদ থাকার কথাও না। সেই চাঁদহীন আকাশের এক রাতে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। নির্ঘুম। হঠাৎ শুনি দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ! 'আব্বু' ভেবে ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে দিলাম। আব্বু না। চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কিছু বলার আগেই চাচা সাবধানী কণ্ঠে বললেন :
-জলদি চলো আমার সাথে! একদম সময় নষ্ট করা যাবে না! আল্লাহ মুসলমানদের কাছে চলে যাওয়ার একটা সুন্দর পথ খুলে দিয়েছেন আমাদের জন্যে!
-কিন্তু আব্বু আম্মু?!!
চোখ গরম করে তাকালেন চাচা আমার দিকে। বললেন :
-তোমার আব্বু কি আমার কথা মতো কাজ করতে বলে নি তোমায়?!
আর কিছু বললাম না। নীরবে তার অনুসরণ করলাম।
একটু পর, আমরা গ্রানাডা ছেড়ে অনেকটা পথ দূরে চলে আসার পর চাচা আমার মাথায় হাত রেখে করুণ সুরে বললেন :
-ধৈর্য ধরো....বৎস! আল্লাহ তোমার আব্বু-আম্মুর সৌভাগ্য এদের হাতেই লিখে রেখেছিলেন!
সাথে সাথে আমার দু চোখে 'বন্যা' বয়ে যেতে লাগলো! মুখ চেপে আমি ধপাস করে নিচে বসে গেলাম! অসহ্য অব্যক্ত বেদনায় মরে যেতে লাগলাম! একটু পর চাচার হাত ধরে বললাম :
-চাচাজান! আমাকে বলুন জলদি কী হয়েছে!
চাচা কেঁদে কেঁদে শোনালেন আব্বু আম্মুর শাহাদতের করুণ কাহিনী।

***

সেই ছোট্ট মুহাম্মাদ আর চাচা অনেক দূরের এক দেশে চলে যেতে পেরেছিলো। সেখানে এক নতুন জীবন শুরু করলো। সেই ছোট্ট মুহাম্মাদ আর 'ছোট্ট' থাকলো না। অনেক বড় হয়ে গেলো। বয়সেও। জ্ঞানে-গুণেও। কে ছিলেন এই মুহাম্মদ? তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম অনেক কিতাবের লেখক সাইয়েদ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রাফী আল আন্দালুসী!
নাম শুনেছো তাঁর! ●

[চলবে]

চাঁদহীন আকাশের এক রাতে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। নির্ঘুম। হঠাৎ শুনি দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ! 'আব্বু' ভেবে ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে দিলাম। আব্বু না। চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কিছু বলার আগেই চাচা সাবধানী কণ্ঠে বললেন, -জলদি চলো আমার সাথে!

ভাষা : আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত

মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন

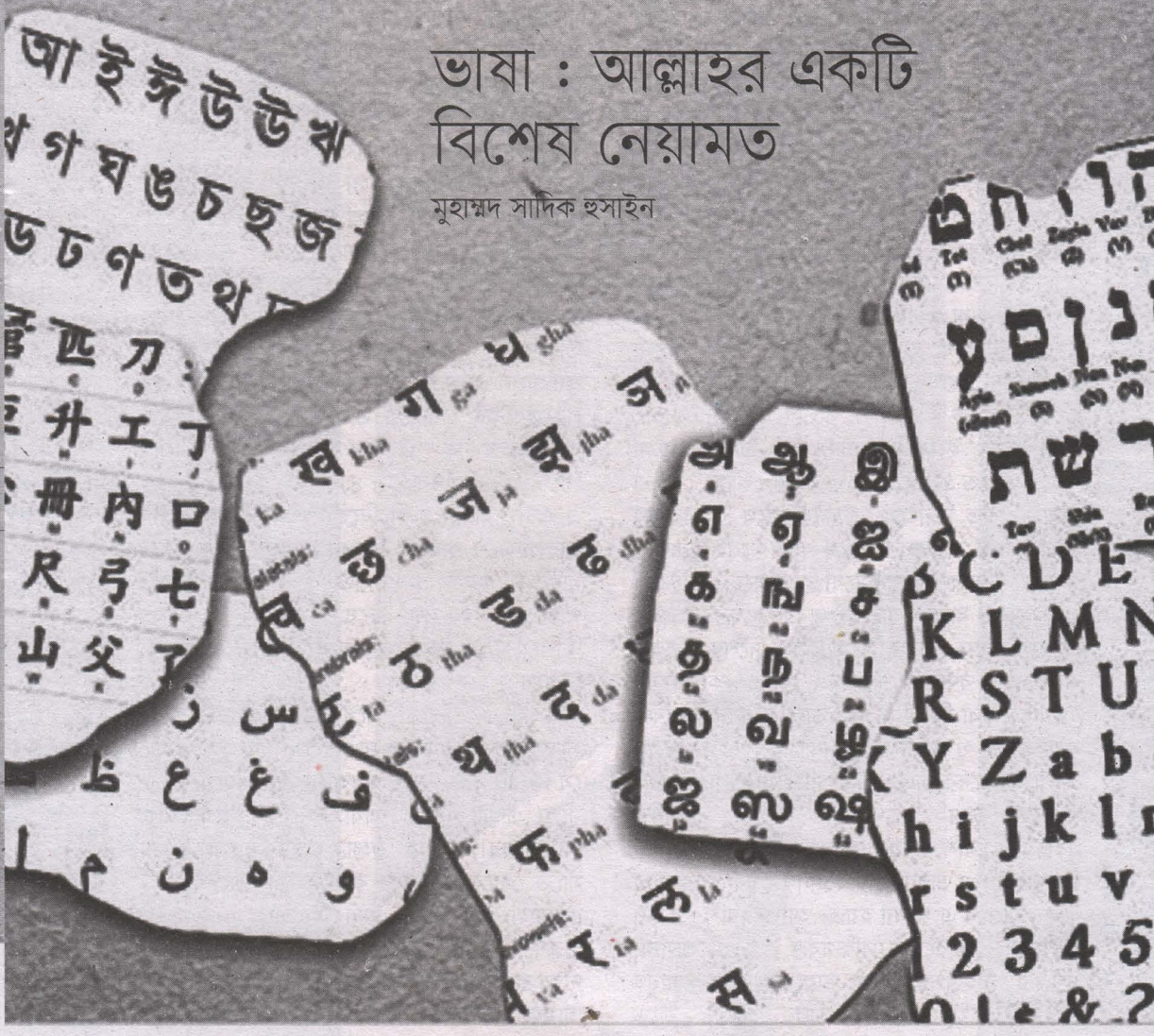

ভাষা ভাবের বাহন। মনের কথা প্রকাশের একান্ত মাধ্যম। হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথাগুলো ভাষার মাধ্যমে মানুষ ব্যক্ত করে। ভাষাবিহীন মানুষ মূক, বোবা। ভাষার কী মূল্য! কী মর্যাদা— একজন বোবাই ভালো জানে। দেখবে, কিভাবে অস্থির হয়ে ওঠে একজন বাকশক্তিহীন মানুষ হৃদয়ের কথা অন্যকে বোঝানোর সময়! হাত, চোখ, ঠোঁট— সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায় মনের ভাবটা প্রকাশের জন্য। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ভাব প্রকাশ করতে পারে না। মনে অতৃপ্তি থেকেই যায়। ওর চেখের দিকে তাকালে কিছুটা বোঝা যায়— অব্যক্ত বেদনা কেমন হাহাকার করছে!

ভাষা সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহমত। ভাষা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। যে নেয়ামতের কোনো তুলনা হয় না, বিকল্প হয় না। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-চেতনা প্রকাশে এক শক্তিশালী মাধ্যম মানুষের মুখের এই ভাষা। ভাষা বিনে একজন মানুষ জানতে পারে না অন্যের আশা-প্রত্যাশা, আঁচ করতে পারে না হৃদয়ের গহীনে থাকা ভালোবাসা। সত্য উচ্চারণে নির্ভীক মানুষ তার চমৎকার ভাষার মাধ্যমেই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন। হাজারো বছর পেরিয়ে গেলেও হৃদয়-নিংড়ানো তার কথাগুলো মানুষের মনে ঝড় তোলে, সত্যের পথে মানুষকে আলোড়িত করে।

পৃথিবীতে বহু ভাষা প্রচলিত। এক পরিসংখ্যান মতে এ সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। কিছু কিছু ভাষা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত। আবার কিছু ভাষা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সীমানায় সীমাবদ্ধ। তবে পৃথিবীর সব ভাষাই আল্লাহর নেয়ামত। ভাষার বৈচিত্রে রয়েছে তাঁর অনেক হিকমত। মানুষের ভাষার বিভিন্নতাকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর আরও নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরা আররূম: ২৩)।

এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। আরবী, বাংলা, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত ভাষা! এগুলো বিভিন্ন ভূখন্ডে প্রচলিত। তার মাঝে কোনো কোনো ভাষা— এত ভিন্ন যে, একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল বা সম্পর্ক আছে বলে মনেই হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে রয়েছে অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য। একেক দেশের একেক বাচনভঙ্গি, বর্ণনার শতরূপ। অথচ কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী কিন্তু সবারই এক ও অভিন্ন। সুবহানাল্লাহ !

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। পৃথিবীর অন্যতম বহুল প্রচলিত ভাষা। গবেষকগণ বলেন, পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলার স্থান সপ্তম। এ ভাষায় প্রায় ২১৭ মিলিয়ন লোক কথা বলে। বাস্তবে এ সংখ্যা হয়তঃ আরও বেশি। কারণ বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, উড়িস্যা, বিহারসহ দক্ষিণ ভারতের অনেক মানুষ বাংলায় কথা বলে। আর পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অভিবাসী ও প্রবাসী লক্ষ-লক্ষ বাংলাভাষী তো আছেই।

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার মাস। ভাষা আন্দোলনের মাস। 'রক্তে-রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলাভাষাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও খ্যাতি। মাতৃভাষার প্রতি আবদুস সালাম, আবদুল জাব্বার, বরকতসহ বাংলার মানুষের অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণ করে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

আচ্ছা। মাতৃভাষা মানে কি? মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। মায়ের মধুর ভাষা। একটি শিশু জন্মের পর সর্বপ্রথম সে মা'কেই তার কাছে পায়, মায়ের কথাই সে প্রথম শুনতে পায়। মায়ের মুখের ছোট ছোট বুলি, মিষ্টি-মধুর কথাগুলি.. ধীরে ধীরে শিশুটিও আওড়ানোর চেষ্টা করে।

মায়ের সব কথাই মধুর, প্রতিটি বাক্যই সুন্দর। মমতাময়ী মায়ের শব্দগুলো শিশুর কচি মনে প্রভাব ফেলে, হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। ঠিক যেন খোদাই করা হয় শক্ত-কঠিন পাথরে। এজন্যই মাতৃভাষার এতো দাম, এতো মূল্য।

ইসলামে মাতৃভাষার মূল্য অপরিসীম। মাতৃভাষা হচ্ছে নিজের ভাষা, স্বজাতির ভাষা। মনের ভাব প্রকাশে মাতৃভাষার তুলনা হয় না। দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য মাতৃভাষা নজিরবিহীন। এজন্যই তো মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মাতৃভাষায়, স্বজাতির ভাষায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সব পয়গম্বরকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে তাদেরকে স্পষ্ট করে তারা সব বুঝিয়ে বলতে পারে।' (সূরা ইবরাহীম: ৪)।

এ জন্য নবী-রসূলগণ নিজের ভাষায় দক্ষ ছিলেন, ভাব প্রকাশে পারদর্শী ছিলেন। আল্লাহর পয়গামকে মানুষের কাছে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। আবেগ দিয়ে। যুক্তি দিয়ে। দরদ মিশিয়ে। তাঁদের ভাষার যাদুর সামনে সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে থ হয়ে যেতো।

মূসা আ.এর ভাষার মধ্যে একটু জড়তা ছিল। সত্যের পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যে তিনটি দুআ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি মুখের ভাষা সংক্রান্ত। অর্থাৎ '(হে আমার রব!) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।' (সূরা ত্বোয়াহা: ২৭-২৮)। এমন কি তাঁর ভাই হযরত হারূনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দু'আ করেছেন, তাতেও একথা বলেছেন, অর্থাৎ 'সে আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী।' (সূরা আল-কাসাস: ৩৪)। এখান থেকে বোঝা যায়, ওয়ায-নসিহত, দাওয়াত-তাবলিগ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা, প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি একান্ত কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। বরং অনেক পছন্দনীয়।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের ভাষায় দক্ষ ছিলেন। অল্পভাষায় অধিক অর্থবহ শব্দ ব্যবহার করতেন। বলতেন, 'আনা আফসাহুল আরাব' অর্থাৎ 'আমি আরবের সবচে' বিশুদ্ধভাষী।' তিনি যখন কথা বলতেন, মনে হতো যেন তাঁর মুখ থেকে মুক্তোর দানা ঝরে ঝরে পড়ছে। সাহাবিরাও তাঁর প্রতিটি কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন, আত্মস্থ করতেন, সে অনুযায়ী আমল করতেন। তাঁর একটি কথাও

হারিয়ে যেতে দেননি। চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সংরক্ষিত হাজার হাজার হাদীসের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার তারই প্রমাণ বহন করে।

আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা। পবিত্র কুরআনের ভাষা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হাজার হাজার হাদীসের ভাষা। দুনিয়াতে আসার পরপরই মানবশিশুর কানে কানে আযানের মাধ্যমে এ ভাষার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিদিন পাঁচবার এ ভাষাতেই আযান হয়। এ ভাষাতেই নামায আদায় করতে হয়। মুআযযিনের সুমধুর সুরে প্রতিদিন হাজারো-লক্ষ মানুষের ঘুম ভাঙে। যার মুগ্ধতায় কবিরা কবিতা রচনা করেন।

কে ওই শোনালো মোরে আজানের ধ্বনী,
মর্মে-মর্মে সেই সুর,
বাজিল কি সুমধুর,
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধ্বমনী।

একজন মুসলমান হিসেবে আরবী আমাদের শিখতেই হবে। বিশেষ করে যারা নবীর উত্তরসূরী, ইলমে দীনের ধারক-বাহক, তাদেরকে তো অবশ্যই এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ভাষাসমূহের মধ্যে আরবীভাষার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আরবী হচ্ছে ঊর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা, ফেরেশতাদের ভাষা, লওহে-মাহফূযের ভাষা, জান্নাতের ভাষা। এছাড়া আরবী ভাষার আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্যই হয়তঃ আল্লাহ তা'আলা আরবীকে তাঁর পবিত্র কালামের জন্য নির্বাচন করেছেন।

তবে পৃথিবীর কোনো ভাষাই মূল্যহীন নয়; প্রত্যেকটি ভাষাই আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। যে নেয়ামতের জবাবদিহি করতে হবে পরকালে। সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা যে কয়েকটি নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সতর্ক করেছেন তার মধ্যে ভাষা ও ভাষার উপকরণ অন্যতম। তিনি বলেন, 'আমি কি তাকে (মানুষকে) দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ? বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।' (সূরা আল-বালাদঃ ৮-১০)। কুরআনে বর্ণিত এ পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

সুতরাং মুখের ভাষার সদ্ব্যবহারে সত্যের সরোবরে অবগাহন যেমন করা যায়, অসীম পুণ্যের ভাগী যেমন হওয়া যায়, দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নতির শিখরে যেমন পৌঁছানো যায়; তেমনি ভাষার অপব্যবহারে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়েও যায় মানুষ। ●

ভালোবাসার চিহ্ন

শরিফ আহমাদ

হাজার হাজার মানুষ পাবে
ভালোও পাবে খুঁজলে
মা-বাবার ন্যায় পৃথিবীতে
আর পাবে না বুঝলে!

মা হয় তোমার গুরু এবং
খেলা-ধুলার সঙ্গী
মা তোমাকে বলতে শেখায়
শেখায় চলার ভংগি ।
মা তোমাকে ইশকুলে নেন
আবার আনেন নীড়ে
মায়ের সকল চিন্তা-ভাবনা
শুধু তোমায় ঘিরে ।
আর বাবাতো বন্ধু তোমার
সাথী ঘুরতে যাবার
পছন্দ সই খেলার জিনিস
সংগ্রহে দেন আবার ।
লেখা পড়ার সাহস যোগান
বুকে যোগান শক্তি
দেশকে ভালোবাসতে শেখান
করতে শেখান ভক্তি ।
মা-বাবার এই রক্তের বাধন
যায় না করা ছিন্ন
যেখানে যাও থাকবে তাদের
ভালোবাসার চিহ্ন ।

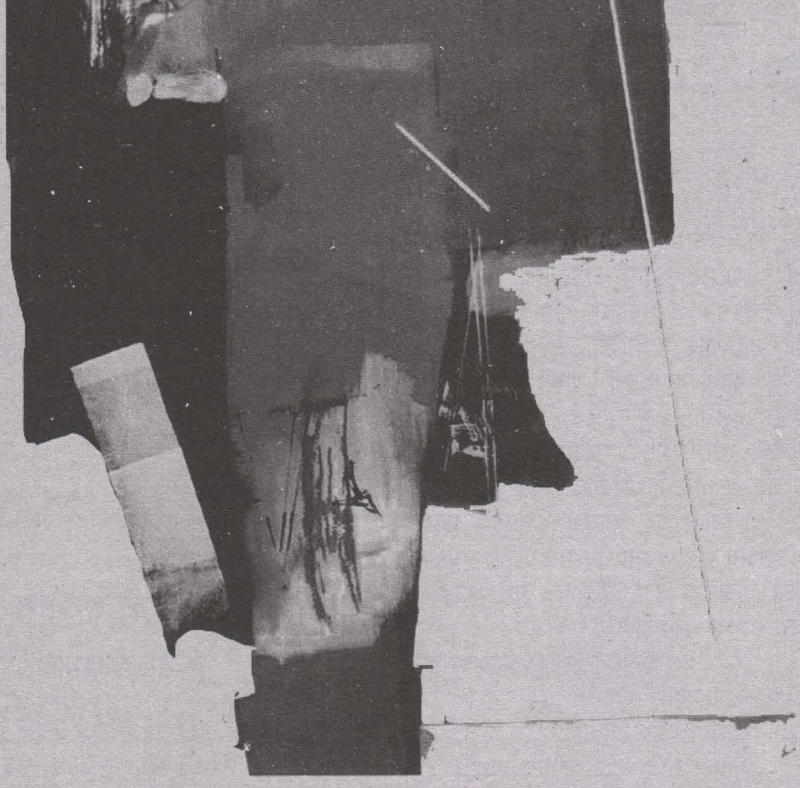

বীরত্বের লাল বিছানা

আবদুল্লাহ তালহা

ইসলামী খেলাফাহর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা.এর শাসনকাল চলছে। হযরত উমরের শাসনকালেই শত শত কুফুরি রাজ্য ইসলামের পতাকাতলে আসে। এসব রাজ্যের মাঝে সবচেয়ে বিরাট আর শক্তিশালী ছিল— রোম সাম্রাজ্য। রোমীয়দের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো হযরত উমরের বাহিনী—মুসলিম সেনাবাহিনী।

এ-যুদ্ধকে বলা হয় ইয়ারমুকের যুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় একটি যুদ্ধ এটি। এ-যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন এমন ইতিহাস রচনা করেছেন মুসলিম বীর সৈনিকরা যার তুলনা মেলা ভার।

মুসলিম সেনাবাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা ছিলো চল্লিশ হাজার। বিপরীতে কাফের রোমীয়দের সৈন্যসংখ্যা ছিলো দু'লাখেরও বেশি। অর্থাৎ কাফের সৈন্য-সংখ্যা মুসলিম সৈন্য-সংখ্যা থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। এক অসম লড়াই।

কিন্তু মুসলমানরা যুদ্ধ করে আল্লাহর হয়ে। আল্লাহর দীন ইসলামকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দেবার জন্য। এজন্য যুদ্ধের ময়দানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। তাই মুসলমানরা কখনো যুদ্ধের ময়দানে ভীত হয় না। সংখ্যা-স্বল্পতায় হতদ্যোম হয় না। পলায়ন করে না।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয়েছে বেশ ক'দিন হলো। হারজিতের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কখনো মুসলিম সৈন্যবাহিনী কাফের সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেয়। কখনো কাফেরদের জোরালো আক্রমণে মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এভাবে একদিন রোমীয় বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর প্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো। ফলে মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তাদের সবগুলো কাতার এলোমেলো হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

মুসলিম বাহিনীর যে কাতারের উপর আক্রমণ করে রোমীয়রা ছত্রভঙ্গ করে দিলো তার নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জেহেল রা.। ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জেহেলের ছেলে। সে তখন মুসলিম সেনাদলের এক অংশের সেনানায়ক।

ইসলাম গ্রহণের আগে ইকরিমা ছিলেন চরম ইসলাম-বিদ্বেষী। তার দিনরাতের ধ্যান-জ্ঞানই ছিলো ইসলামের ক্ষতি করা, রাসূলুল্লাহর জীবন নাশ করা। মক্কা বিজয়ের পর যখন আমাদের প্রিয় নবী দয়ার সাগর মুহাম্মদ সা. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। তখন সেই দয়ার বৃষ্টিতে ইকরিমাও সিক্ত হলেন। তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। হলেন সাহাবী ইকরিমা রা.।

আসলে আল্লাহ তা'আলার রহমত অসীম। ঐ যে আকাশ, তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু আল্লাহর রহমত ও দয়ার কোন সীমা পরিসীমা নেই। ঐ যে আকাশের সাথে মিশে যাওয়া সমুদ্র তারও একটা শেষ আছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহের কোন শেষ নেই। এই দয়া ও অনুগ্রহের ওসীলায় দুষ্ট দুরাচার ইকরিমা হলেন বীর সাহাবী ইকরিমা রা.।

ইকরিমা সারা জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এজন্য মুসলমান হবার পর থেকেই মনে বড় আশা ছিল ইসলামের জন্য লড়ার। অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিলো আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করার।

যখনই ইকরিমা শুনলেন রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযানে বের হচ্ছে সাথে সাথে সেই বাহিনীতে তিনি শরিক হয়ে গেলেন। বীর ইকরিমা অমিত তেজে লড়াই করলেন। তার রণনৈপুণ্যে মুগ্ধ হলেন সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। তাই হযরত ইকরিমাকে তিনি একটি বিরাট সৈন্যদলের আমীর বানিয়ে দিলেন।

ইয়ারমুকের এই ময়দানে বীর ইকরিমা যখন দেখলেন তার বাহিনীকে আক্রান্ত করে রোমীয়রা মুসলমানদেরকে পরাভূত করতে যাচ্ছে তখন তার বীর হৃদয়ে ঈমানের ঝড় সৃষ্টি হলো। তিনি সামনের দিকে দ্রুত বেগে অশ্ব ছোটালেন আর বজ্র হুংকারে রোমীয়দেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর শত্রু রোম বাহিনী! একসময় এই ইকরিমা আল্লাহর প্রিয় রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আজ কি সে তোমাদের ভয়ে পালাবে? কখনো নয়! খোদার কসম করে বলছি, এমন কথা কল্পনাতেও ভাববে না!

এ-বলে তিনি নিজ সেনাদলের দিকে তাকালেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে দরাজ গলায় আহ্বান করলেন, যে যে আমার হাতে হাত রেখে মৃত্যুর ওপর বাইয়াত হতে চাও, এগিয়ে আসো।

তার আহ্বানের চারশত বীর মুজাহিদ মৃত্যুর ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন। হয় মরবেন, নয় শত্রুদের খতম করবেন—এই তাদের পণ। এদের মাঝে হযরত ইকরিমার দুই কলিজার টুকরোও ছিল। দুজনই টগবগে যুবক। পিতা-পুত্র সবাই আজ আল্লাহর সামনে জীবনের নাযরানা পেশ করতে প্রস্তুত। চারশত জনের এই জানবায মুজাহিদ বাহিনী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা, এর তাঁবুর সামনের দিক থেকে দুর্বার গতিতে লড়াই শুরু করলেন। একেক জন করে শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়ছিলেন অনেকেই। কয়েকজন হলেন মারাত্মক জখম। তবে জানবায এই বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে রোমীয়রা পিছু হটে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। ফলে মুসলিম বাহিনীর মাঝে আবার তেজ ও যুদ্ধের চেতনা ফিরে এলো।

যুদ্ধ শেষে হযরত খালিদ রা. এলেন ইকরিমা রা. এর বাহিনীর নিকট। আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন তিনি ও তার দুই সন্তান। শহীদদের রক্তে সে ভূমি তখন লাল দরিয়া হয়ে গিয়েছে। হযরত ইকরিমা ও দুই সন্তানের শরীর থেকেও অঝরে ঝরছে তপ্ত রক্ত।

সেনাপতি খালিদ রা. তাদের মাথা নিজ কোলে তুলে নিলেন। নিজ হাতে তাদের চেহারা থেকে রক্ত মুছে দিলেন। সুপেয় পানি ঢাললেন পিতা ও পুত্রদ্বয়ের মুখে। এই মোবারক রুহগুলো নিয়ে যাবার জন্য তো আগে থেকেই ফেরেশতারা অপেক্ষা করছিলেন। এখন সময় হলো। ফেরেশতারা নিয়ে চললেন এই পবিত্র রুহগুলো প্রিয় প্রভুর দরবারে। শহীদ হয়ে গেলেন হযরত ইকরিমা রা. ও তার কলিজার টুকরো দুই পুত্র।

আত্মোৎসর্গের এমন হাজারো বীরত্বগাথায় লিখিত হলো অত্যাচারী কাফের রোমকদের পরাজয়-ইতিহাস। এখন ইয়ারমুক আমাদের বিজয়ের প্রতীক। গর্বভরে আমরা উচ্চারণ করি—বদর-ওহুদ-ইয়ারমুক-কাদিসিয়া। ●

এই বাংলা আমার

সাকিব মুস্তানসির

এইখানে এই বাংলাদেশের স্বপ্ন জমিন আছে
এইখানে যে ঋণের বোঝা বাংলা মায়ের কাছে।
এখানে আছে হাসি খেলা আর আযানের সুর
রাতের আঁধার কেটে জেগে উঠে সোনালী ভোর।

এইখানে তব নিত্য সুখের পাপড়ি মেলে ফুলে
এইখানে যত আনন্দরা কাঁদা মাখে মনের ভুলে।
এইখানে প্রতি পরতে লেখা আল-কুর'আন
হাজারো ঘাম আর রক্তে রাঙে মানবতার গান।

এইখানে আছে সবুজ বনানী পাখিদের মেলা
এইখানে আছে নদীর ঢেউয়ে মাছেদের খেলা।
এইখানে প্রতি ভোরের আলোয় মক্তবে হয় বসা
সত্য পথের যাত্রীরা সব পায় যে আলোর দিশা।

এইখানে আছে নীল আকাশে গাঙচিলের ছায়া
এইখানে তব বিলের জলে শাপলা ফুলের মায়া।
এইখানে জাগে যুবক কিশোর রক্ত বিলোতে যখন
সবুজের বুকে লাল মাখিয়ে মানচিত্র হয় তখন।

আমার মা

আমির সিদ্দীক

মাকে নিয়ে গর্ব করি
করি অহংকার
মাকে ছাড়া সর্বহারা
হবে যে সংসার।

মা আমার মাতিয়ে রাখে
শাসন-যত্ন করে
মধুর সুরে মায়ের ডাকে
যায় মনটা ভরে।

বায়না ধরি মায়ের কাছে
দাওনা 'এটা' কিনে,
মজার যত জিনিস আছে
দেন যে আমায় এনে।

এ উদ্যানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। শুধু ফুলপ্রেমীরা এখানে প্রবেশ করবে। এখানে আছে অনেক ফুল। রঙ-বেরঙের। নানা বর্ণের নানা জাতের। নানা ঘ্রাণেরও। তোমাদেরকে এ উদ্যানে স্বাগতম!

সুলাইমানিয়া মসজিদ

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের অনন্য শোভা

উসমানী শাসনামলের সুলতান সুলাইমান আল-ক্বানুনীর (রাজত্বকাল: ৯২৬-৯৭৪ হিজরী) বিখ্যাত এক কীর্তি হলো সুলাইমানিয়া মসজিদ নির্মাণ। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ১৫৫০ থেকে ১৫৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। এটি মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অনন্য কীর্তির পরিচায়ক এবং উসমানী খেলাফত আমলে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম অবদান হিসেবে স্বীকৃত। এটি তুরস্কের সবচে' বড় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদও বটে। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে।

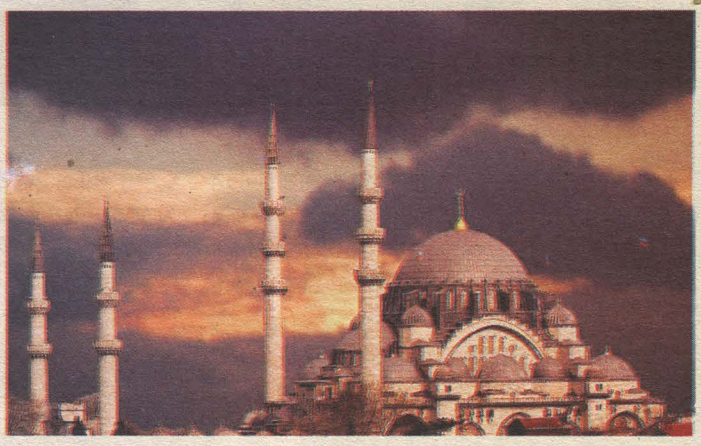

সুলাইমানিয়া মসজিদের অবস্থান : ইতিহাসখ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করতে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার এবং দেখতে বেশ দৃষ্টিনন্দন ও মনোলোভা— এমন স্থান নির্বাচন করা হয়। ইস্তাম্বুলের বায়জিদ অঞ্চলের অনিন্দ্য সুন্দর 'বসফরাস' প্রণালীর কোল ঘেঁষা একটি ছোট্ট টিলার উপর গড়ে তোলা হয় মসজিদটির অবকাঠামো। যেখানে সূর্যর কিরণগুলো বসফরাসের স্ফটিকস্বচ্ছ পানিতে সোনাখচিত রশির মতো ঝিলিক খেলে। এমন হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখলে দর্শকের ভাবুক মন অবচেতন ভাবেই সজীব সজীব হয়ে ওঠে। বর্তমানে সুলাইমানিয়া মসজিদের পাশঘেঁষে প্রাচীন একটি স্থাপনায় ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সুলাইমানিয়া মসজিদের নির্মাণ প্রসঙ্গ : সুলতান সুলাইমান আল-ক্বানুনী যখন 'দেখলে চোখ ফেরাতে মন চায় না' এমন একটি মসজিদ নির্মাণের সংকল্প করলেন— তখন তুরস্কের সবচে' বিখ্যাত ও কুশলী প্রকৌশলী সানান পাশাকে দায়িত্ব অর্পন করেন। ইতিহাসে রয়েছে, নির্মাণকাজ আরম্ভ করার পূর্বে সানান পাশা সুলতানের কাছে মসজিদের যাবতীয় নকশা, রেখাচিত্র, ভাবনা ও পরিকল্পনার রূপ পেশ করেন। সুলতান সানান পাশার দক্ষতা ও চিন্তা-পরিকল্পনার সৌন্দর্য দেখে খুবই আনন্দিত হন। তার পরিকল্পনার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং নিজের ধনভাণ্ডার থেকে অবাধে খরচ করার আদেশ করেন।

সুলাইমানিয়া মসজিদের অবকাঠামো : মসজিদটির দৈর্ঘ ৬৯ মিটার ও প্রস্থ ৬৩ মিটার। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ অনায়াসে একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারে এতে। মসজিদের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় চার কোণে সুউচ্চ ও সুরম্য চারটি মিনার মসজিদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।

মসজিদের মেহরাবের অভ্যন্তর ইসলামী কারুকার্যের বিভিন্ন উপাদানে পরিপুষ্ট। চোখ ধাঁধানো বৈচিত্র ও রঙতুলিতে আঁকা লতা-গুল্ম এবং সবুজ শ্যামলিমার হরেক রকম দৃশ্য আর কুরআনের আয়াত অঙ্কিত ফলকগুলি চোখে পড়লে আশ্চর্য জাগানিয়া অন্য রকম এক আবহ কাজ করে মুসল্লির মন-মানসে। চিত্তাকর্ষক মেহরাবটির পাশেই রয়েছে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি সুসংহত মিম্বার। বিভিন্ন রঙের কাঁচের জানালাগুলো দিয়ে যখন সূর্যের আলোক-রশ্মি খেলা করে মনে হয় মসজিদে যেন সহস্র রঙের পসরা সাজানো হয়েছে।

মসজিদের আঙ্গিনার চারশাশ ঘিরে রয়েছে সবুজ সজীব এক উদ্যান। সামান্য দূর থেকে যখন এ মনোরম দৃশ্য অবলোকন হয় তখন— বাগানের বুলবুলিদের গানের সাথে সুর মিলিয়ে সুউচ্চ মিনারগুলি যেন নীলাভ আকাশটি ছুঁতে দেখতে চাইছে। সে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য! অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ নকশা ও অসম্ভব সুন্দর চিত্রাঙ্কন ছাড়াও সুলাইমানিয়া মসজিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো— বিশালত্ব ও সুপরিব্যাপ্তি। মসৃন ও ঝকঝকে টালি বসানো মেঝে দেখতে-ই অসাধারণ। মসজিদের দেয়ালগুলোর অন্যতম সৌন্দর্য হলো— সাতরঙ দিয়ে বার্ণিশ করে বর্ণালী দৃশ্য আঁকা এতে। দৃশ্যগুলো সোনালী ও কালো সুতো দিয়ে বেগুনী-লাল রঙ, গাঢ় নীল রঙ এবং অন্যান্য রঙ দিয়ে চিত্রায়িত। টিউলিপ ফুল, ভায়োলেট ফুল, লবঙ্গ-গাছ, ডেইজি ফুল, আঙ্গুরের পাতা ও আপেল গাছের ছবি ফুটে আছে ভেতরের প্রতিটি দেয়ালে।

সবকিছুর বর্ণনা দিতে গেলে কিন্তু ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়! সেগুলো সরাসরি না দেখলে মনের প্রকৃত তৃষ্ণা হয়তো মিটবে না। চলোনা একদিন গিয়ে ঘুরে আসি...!!

আকাশ ছোঁয়া মসজিদ!!

বিশ্বের সর্বোচ্চতায় অবস্থিত মসজিদের নাম 'বাদশাহ আবদুলাহ মসজিদ'। পৃথিবীর মাটি থেকে ১৮৩ মিটার উচ্চতায় নির্মিত এ মসজিদ ২০০৩ সালের ১৩ অক্টোবর উদ্বোধন করেন সৌদি প্রয়াত বাদশাহ আবদুলাহ। তখন তিনি সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ছিলেন।

পৃথিবীতে সর্বাধিক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদ গিনিজ বুকে নাম লিখিয়েছে। বর্তমান সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ভবন 'কিংডম টাউয়ার'এর ৭৭ তম তলায় অবস্থিত এ মসজিদের আয়তন ১১০ বর্গ মিটার। অনেকে এ মসজিদকে আকাশ ছোঁয়া মসজিদও বলে থাকেন।

আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা মসজিদটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দনশীল ও বিশ্বখ্যাত এই মসজিদে এক সাথে ৮৫ জন মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আগত ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের অন্যতম আগ্রহের স্থান হচ্ছে 'পৃথিবীর মাটি থেকে সর্বোচ্চতায় অবস্থিত' এ মসজিদ। ●

কে বেশি সফল?

এই যে সুন্দর পৃথিবী। অবাক করা আসমান। তরতর করে বয়ে চলা নদী। উঁচু উঁচু পাহাড়। কলকল ধ্বনিতে ছুটে চলা ঝর্না। আরো কত কি। মহান আল্লাহর এই জমিনে আছে কোটি কোটি মানুষ। একেক মানুষের একেক রকম কামনা-বাসনা। স্বপ্ন-সাধ। সব মানুষই দুনিয়াতে সফল হতে চায়। নাম চায়, অর্থ চায়, বাড়ি চায়, গাড়ি চায়। সব মানুষেরই চাওয়া-পাওয়ার একটি অন্তহীন দিগন্ত আছে।

মানুষ চায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ুক দেশ থেকে দেশান্তরে। কোটি কোটি মানুষের কাছে। কিন্তু এর জন্য-যে চেষ্টাও করতে হবে, কাজও করতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে, তা কিন্তু অনেকেই জানে না।

তবে কিছু মানুষ আছে যারা নাম চায় না। তবে সফলতা চায়। সত্য চায়, সুন্দর চায়। যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে চায়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ভালোবাসা ও আনুগত্যে নিজেকে নিবেদন করতে চায়। তারাই ভালো মানুষ। তারা না চাইতেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি। তাদেরকে ভালোবাসে সব মানুষ। না, তাদের জীবনের কোনো চাহিদা অপূর্ণ থাকে না। জীবন চলার জন্য যা প্রয়োজন, তা চলে আসে না চাইতেই। কে বেশি সফল বলো তো বন্ধুরা?

ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আবু হানিফা ইরাকের কুফায় ৫ সেপ্টেম্বর ৬৯৯ ইংরেজি মোতাবেক ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪ জুন ৭৬৭ ইংরেজি ১৫০ হিজরী ইন্তেকাল করেন। সাহাবী আনাস ইবনে মালিক রা এর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কারণে তিনি একজন তাবেঈ। ইমাম আবু হানীফা রহ. আটজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন।

তাঁরা হচ্ছেন-

১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. (ওফাত ৯৩ হিজরী)

২) আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. (ওফাত ৮৭ হিজরী)

৩) সহল ইবনে সা'দ রা. (ওফাত ৮৮ হিজরী)

৪) আবু তোফায়ল রা. (ওফাত ১১০ হিজরী)

৫) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়দী রা. (ওফাত ৯৯ হিজরী)

৬) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. (ওফাত ৯৪ হিজরী)

৭) ওয়াসেনা ইবনুল আসকা রা. (ওফাত ৮৫ হিজরী)

সাহিত্য সভা কবে হবে

কিশোরস্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে সুন্দর আগামীর। সাহিত্য নিয়ে আমরা কাজ করবো কিশোরস্বপ্নের ব্যানারে। কিন্তু কিশোরস্বপ্নের সাহিত্য সভা কবে হবে?

তাহমিদ আবরার

চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা।

কিশোরস্বপ্ন : তাই তো! কবে হবে সাহিত্য সভা! হওয়া প্রয়োজন। হবে ইনশা-আল্লাহ। আগে নিজেরা তৈরি হও। তৈরি করো নতুন কিছু বন্ধু। একদিন ডাক পাবে। পূরণ হবে তোমাদের প্রত্যাশা।

ধন্যবাদ হে কিশোস্বপ্ন!

স্বপ্ন। শব্দটি অনেক পরিচিত। যেমন পরিচিত তেমনই প্রিয়। সবার কাছে প্রিয়। আমার কাছেও প্রিয়। অনেক প্রিয়। সবাই স্বপ্ন দেখে। দেখতেও ভালোবাসে। অনেকে অনেক রকমের স্বপ্ন দেখে। লালন করে হাজারো স্বপ্ন মনের অজান্তে হৃদয়ের মাঝে। আর আমি! আমি স্বপ্ন দেখি লেখক হওয়ার। সাহিত্য শেখার। সাহিত্যের সাজে নিজেকে সাজাবার। কিন্তু কীভাবে সাজাব নিজেকে? কীভাবে বাস্তবায়িত করব এই স্বপ্ন? ভাবতে ভাবতেই চলে এলো আমার হাতে কিশোরস্বপ্ন! আর কিশোরস্বপ্ন আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আমার এই স্বপ্নেরও বাস্তবায়ন শুরু হলো। তোমাকে ধন্যবাদ হে কিশোরস্বপ্ন! সাহিত্য শেখার এই মিশনে তোমার আলোতেই আমরা পথ চলবো।

জাকায়িয়া, ২য় বর্ষ

বাইতুর রাসূল মাদরাসা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

কিশোরস্বপ্ন : আমি শব্দের ফেরিওয়ালা। সাহিত্য নিয়ে ঘুরি তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে। ভয় পেয়ো না। আগামী দিন তোমাদের। সত্য সন্ধ্যানী সুন্দর মানুষগুলোর। এগিয়ে আসো! আমি তোমাদের এবং তোমাদের জন্য।

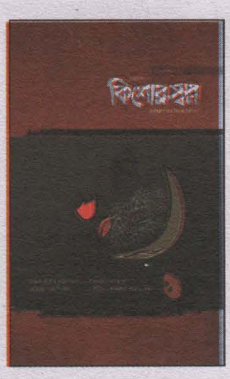

স্বপ্নের একটি স্বপ্ন থাকে

তামিম তারাবী

কিশোরস্বপ্ন একটি দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্নের নাম। তোমরা একমত হবে কি না জানি না। আমার কাছে তাই মনে হয়। আমি কিশোরস্বপ্নের প্রতিটি পাতায় পাতায় খুঁজে পাই জীবন গড়ার স্বপ্ন। এতো সুন্দর, এতো সুচারু কোনো পত্রিকা আমি আর দেখিনি, পড়িনি। আমি আছি কিশোরস্বপ্ন-এর সাথে। যারা স্বপ্ন দেখ তারাও থাকো কিশোরস্বপ্ন-এর সাথে। আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

মাসউদুর রহমান

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গত সংখ্যার পর

৮. সবচে' ভালো কিতাব .. সবচে' প্রিয় কিতাব

ভালো ভালো নবী এসেছেন।
ভালো ভালো কিতাব নিয়ে।
হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এসেছেন তাওরাত নিয়ে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এসেছেন যাবূর নিয়ে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন ইঞ্জিল নিয়ে। সবার পরে এসেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচে' প্রিয় কিতাব নিয়ে এসেছেন।
আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব নাযিল করেছেন।
হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাদের নবীজীকে
এই কিতাব পাঠ করে করে শুনিয়েছেন।
কুরআন আল্লাহর কালাম।
কুরআন আল্লাহর পয়গাম।
কুরআন আল্লাহর বিধান।
কুরআনের সব কথা সত্য।
সব কথা প্রিয়।
জানো তো, কোন্ ভাষায় নাযিল হয়েছে— এই কুরআন?!
প্রিয় ভাষা— আরবী ভাষায়।
কতো প্রিয় ভাষা— এই আরবী ভাষা!
কুরআন আল্লাহর কতো বড় রহমত।
কুরআন আল্লাহর কতো বড় নেয়ামত।
এই কিতাব বড়ো বরকতময়।
এসো-না, এই কিতাব আমরা পড়ি!
আর বরকত লাভ করতে থাকি!
সিক্ত হতে থাকি কুরআনের অফুরন্ত রহমত ও বরকতের শীতল বারিধারায়!
হে আল্লাহ! তোমার ক্ষুদে বান্দাদের দু'আ কবুল করো! তোমার রহমত ও বরকতে আমাদের দিল ভরে দাও!
হে আল্লাহ!
কুরআন পড়া আমাদের জন্যে সহজ করে দাও!
কুরআন মুখস্থ করাও আমাদের জন্যে সহজ করে দাও!
হে আল্লাহ!
আমরা কুরআন পড়বো আর তুমি সন্তুষ্ট হবে! খুশি হবে! কুরআন হোক আমাদের জীবনের বসন্ত! কুরআনের হরফে হরফে গড়ে উঠুক আমাদের ভালোবাসা!
হে আল্লাহ!
কুরআনের আলোয় আলোকিত করে দাও আমাদের দৃষ্টি!
কুরআনের বরকতে ক্ষমা করে দাও আমাদের ছোট বড় সব গোনাহ! আমাদের চিন্তা চেতনাকে আলো ঝলমলে করে দাও!
আমরা কুরআনকে ভীষণ ভালোবাসি।
সকাল সন্ধ্যা তিলাওয়াত করি।
হে আল্লাহ!
সব সময় তিলাওয়াত করি!

[চলবে]

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক/এজেন্ট হওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৩০% কমিশনে এজেন্ট করা হয়। প্রতি ২০ কপির সাথে ১ কপি সৌজন্য দেয়া হয়। ভি.পি.এল ডাকযোগে বা কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। কুরিয়ারযোগে পত্রিকা নিতে বিকাশে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। (টাকা পাঠানোর সময় অবশ্যই গ্রাহক/এজেন্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।)

বিশেষ সংখ্যাসহ গ্রাহক চাঁদা

	বার্ষিক	ষান্মাসিক
সাধারণ ডাক :	৩০০/=	১৫০/=
রেজি. ডাক :	৩৫০/=	১৭০/=

(বছরের যে কোন সময় পূর্ণ ঠিকানা ও বিকাশে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগ

মাসিক কিশোরস্বপ্ন

বাড়ি ১/৭, রোড এন.এস [বাইতুল আতিক জামে মসজিদ রোড]
ব্লক এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা ১২১৯, ০১৮৭৫ ৪৯৪৯৯৭
০১৯৭৫ ৪৯৪৯৯৭, kishorshopno@gmail.com

স্বপ্ন পরিবারে তোমাদের স্বাগতম

কিশোর উদ্যানে যারা সদস্য হলে

মুহা. মাজহারুল ইসলাম তাহসিন রেজা পিতা : মরহুম, আ. লতিফ জামাত : হেদায়াতুন্নাহু জামিয়া আবু বক্কর সিদ্দিক রা, যাত্রাবাড়ি।	বেলাল হুসাইন পিতা : নূরুল ইসলাম শ্রেণি : ২য় বর্ষ বাইতুর রাসূল সা. মাদরাসা, হাজারীবাগ।	ফাহিম আবরার পিতা : লুৎফুর রহমান শ্রেণি : ২য় বর্ষ বাইতুর রাসূল সা. মাদরাসা, হাজারীবাগ।

কিশোর উদ্যান সদস্য ফরম

আমি স্বপ্ন দেখি, আমি বড় হতে চাই, চাই লেখক হতে। তাই কিশোরস্বপ্ন-এর সদস্য হতে চাই।
আমি কিশোর উদ্যানের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলবো।

নাম _____ পিতার নাম _____

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান _____ শ্রেণি _____

স্থায়ী ঠিকানা _____

মোবাইল _____

নিয়মাবলি

■ যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নচারী ছাত্র-ছাত্রীরাই কিশোর উদ্যানের সদস্য হতে পারবে। ■ নির্ধারিত কুপনটি কেটে ৫০ টাকাসহ কিশোর উদ্যান বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে।
■ সদস্য নং সহ পুরো ঠিকানা কিশোরস্বপ্ন-এ ছাপা হবে। ■ সাহিত্য সভা ও কিশোর উদ্যানে সদস্যদেরকে প্রধান্য দেয়া হবে।
■ সর্বোপরি কিশোর উদ্যানের সদস্য মৌলিকভাবে কিশোরস্বপ্ন পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রাণের উৎসব

মাহদী খান অয়ন, *সদস্য নং ০৯*

যেদিন জানতে পারলাম যে, 'মাসিক কিশোরস্বপ্ন' এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব হবে, সেদিন থেকে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে লাগলাম। কেমন যেন সময় ফুরাতেই চাচ্ছিল না। সময় চলছিলো মন্থর গতিতে। রং-বেরঙের স্বপ্ন দেখতে থাকলাম 'কিশোরস্বপ্নের' উৎসবকে ঘিরে। অবশেষে অবসান ঘটলো সে প্রতীক্ষিত সময়ের। স্বপ্নেরা এসে সবকিছু করে দিল স্বপ্নময়। ভালবাসার টানে ছুটে গেলাম নির্দিষ্ট স্থানে। পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই। অংশগ্রহণ করলাম সে স্বপ্নময় 'মাসিক কিশোরস্বপ্ন' এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার বর্ণাঢ্য উৎসবে। সেখানে আছেন ছোট-বড়, লেখক, পাঠক সকলের এক মহামিলন। হেসে উঠলো, তিন প্রজন্মের সবগুলো মুখ, একই দিনে, একই দর্পণে।

তখন সবার মাঝে বিরাজ করছিলো আবেগ-উচ্ছ্বাস। ঠিক ঠাওর করতে পারছিলাম না যে, আমি কি জমিনে বিচরণ করছি, নাকি তারকাময় আসমানের!! বড়দের দেখে হচ্ছিলাম অভিভূত। কথা শুনে আবেগে-আপ্লুত। খুব ইচ্ছে করছিল, তাঁদের চরণধূলি কপালে মেখে ধন্য হই।

অনেক কিছু শিখলাম আমি। শিখলাম স্বপ্ন দেখতে। এ দিনটি আমার জীবনের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আল্লাহ্ যেন এ মহতি, বর্ণাঢ্য উৎসবের মহান ব্যক্তিত্ব, লেখক-পাঠক, আয়োজক ও সহযোগীদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন। সকলকে দ্বীন-দুনিয়ার খোশহালি দান করেন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।।

ঘুমিয়ে গেলেন বাবা

ইব্রাহিম বিন শওকত

নাহ কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে সব কিছু। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে এ পৃথিবী। সারা রাত ঘুম হয়নি। কি সব আজে- বাজে স্বপ্ন দেখেছি। দুয়া- দুরূদ ও পড়েছি। নামাজ আদায় করার পর মনকে একটু ভালো করার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করছি। এমন সময় খাদেম সাহেব ডাক দিলেন আরাফাত! আরাফাত! তোমার চাচা এসেছেন। নিচে চলো।

মনটা আজ এমনিতেই খারাপ। কিছুই ভালো লাগছে না। আবার এর মধ্যে এত ভোরে চাচা এসেছেন। বাড়িতে কিছু হয়নি তো! এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নিচে এসে পৌঁছলাম।

মাজেদ চাচা বললো, আরাফাত এসেছ? তোমাকে যে, এখনি বাড়িতে যেতে হবে। কিন্তু চাচা এত ভোরে কেন? কি হয়েছে বাড়িতে?

সবই বলবো, সবই জানতে পারবে। আগে তো বাড়িতে যাবে।

আমি মাজেদ চাচার সাথে বাড়ির দিকে যাচ্ছি আর ভাবছি। বাড়িতে কী এমন হতে পারে? যার কারণে এত ভোরে আমাকে নেওয়ার জন্য চাচা এসেছেন! বাড়িতে তো একমাত্র আমার অসুস্থ পিতা আছেন। তা ছাড়া তো আর কেউ নেই। তাহলে কি... নাহ কিছুই মাথায় আসছে না। সেই চার বছর বয়সের সময় মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। মায়ের মৃত্যুর সময় মায়ের আদর বা মা হারানোর কষ্ট কোনটাই বুঝতাম না।

কিন্তু এখন বুঝি, শুধু বুঝিই না অনুভবও করি। কত রাত যে চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়েছি তার কোন ইয়ত্তা নেই।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবার আদরে বড় হয়েছি। কয়েকদিন ধরেই বাবা খুব অসুস্থ। মাজেদ চাচার এমন অসময়ে মাদরাসায় আসা তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। জানি না তিনি কী অবস্থায় আছেন। যখন বাড়িতে এসে পৌঁছলাম দেখলাম অনেক লোক বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। মাজেদ চাচাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? চাচা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

মাজেদ চাচা কোন উত্তর দিচ্ছেন না।

তাকিয়ে দেখি তার কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলাম বাবা এ অস্থায়ী জগৎ ছেড়ে চিরস্থায়ী জগতের পথ ধরেছেন। তখন যে আমার কী অবস্থা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কাঁদতে কাঁদতে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালাম। অনেক লোক বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাবা ঘুমিয়ে আছেন। তখন কত ডেকেছি একটি বারের জন্যও সাড়া দেয়নি। কত শান্তির সে ঘুম। সে ঘুম তো ভাঙ্গবার নয়।

হাসতে নাকি জানতে নাকি?

আমি কে

বাইরে থেকে দরজা নক করছে।
ভেতর থেকে: কে?
বাইরে থেকে: আমি।
ভেতর থেকে: আমি কে?
বাইরে থেকে: আরে, আপনি কে আমি কী করে বলব?

বারবার যেতে নাই

বাবা আর ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে
বাবা: বুঝলে বাবা, এক জায়গায় বারবার যেতে নাই। আদর থাকে না।
ছেলে: ঠিকই বলেছ বাবা, সে জন্যই তো প্রতিদিন স্কুলে যেতে চাই না। অথচ মা আমাকে পিটিয়ে স্কুলে পাঠান।

নানু-নাতি

নানু ও নাতির মধ্যে কথা হচ্ছে–
নানু : বলতে পারিস, তোর বাবার বয়স এখন কত হলো?
নাতি- কেন, দশ বছর।
নানু : তা কি করে হয়? তোর বয়সই তো দশ বছর।
নাতি : সে জন্যই তো বলছি, আমার জন্মের পরই তো তিনি বাবা হয়েছেন!

বাবা ডাকবি না

বাবা : যদি ফেল করিস তবে আমাকে তুই আর বাবা বলে ডাকবি না! বলে দিলাম .. (রেজাল্ট বের হওয়ার পর) বাবা : কিরে তোর রেজাল্ট কেমন হল ? কিছু তো বললি না!
ছেলে: আমি দুঃখিত, রফিক সাহেব

নকল করেছি

প্রথম বন্ধু: কিরে, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?
দ্বিতীয় বন্ধু: কোনো প্রশ্নই কমন পড়ে নি। তাই সাদা খাতা জমা দিয়ে এসেছি।
প্রথম বন্ধু: সর্বনাশ করেছিস। আমি ও তো সাদা খাতা জমা দিয়েছি। সার মনে করবে, আমি তোরটা নকল করেছি।

কত কিছু অজানা

পানি নিয়ে যা কিছু অজানা

কথায় বলে, কিছু কাজ নাকি 'পানির মতো সহজ'। কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে পানি কিন্তু খুব সহজ পদার্থ নয়। পানি নিয়ে জানার আছে অনেক কিছু। এই বিশ্বজগতে পানির ভূমিকা অপরিহার্য, আর প্রকৃতিতে পানির রয়েছে নানান মজার রূপ। কখনও বরফ, কখনও জলীয় বাষ্প। কখনো সুপেয় সুমিষ্ট। আবার কখনো লোনা। আরও যে কত কী! চলো আজ জেনে নিই এই পানি সম্পর্কিত মজার কিছু তথ্য :

- দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা একটি পানির অণু তৈরি হয়।
- জীবজগতে টিকে থাকার জন্য পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রকৃতিতে তিনটি অবস্থায় পানি পাওয়া যায়- কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
- পানি বলতে আমরা মূলত H_2O এর তরল অবস্থাকে বুঝি। পানির কঠিন অবস্থাকে বরফ এবং বায়বীয় অবস্থাকে জলীয়বাষ্প বলা হয়।
- ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পানি রয়েছে তিনটি মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর এর মাঝে সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। আর ভারত মহাসাগর রয়েছে আকারের দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে। তোমরা জেনে অবাক হবে, আমাদের বঙ্গোপসাগর কিন্তু এই ভারত মহাসাগরেরই একটি অংশ।
- প্রশান্ত মহাসাগরে রয়েছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ নামের এক অদ্ভুত জায়গা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম স্থান।
- চাঁদের এবং সূর্যের টান এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির কারণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। আর এই জোয়ার-ভাটার জন্যেই সমুদ্রের পানিতে ঢেউ দেখা যায়।
- প্রতি এক কেজি সমুদ্রের পানিতে প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায়।
- সাধারণ পানি ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয়। কিন্তু সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকায় তা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ই বরফে পরিণত হয়ে যায়।

প্রকাশিত হয়েছে...

গত আট বছরের নির্বাচিত দৃশ্য
হৃদয়জাগানিয়া, শিক্ষণীয়
এবং এখনো জনপ্রিয়

মাসিক আলকাউসার-এর
শেষপাতাগুলোর আয়োজন

শরীফ মুহাম্মদ-এর

ফিলহাল

একসঙ্গে তিনটি বই... আকর্ষণীয় প্যাকেটে...

ফিলহালের এক ঝলক

ক্ষয় ও জয়ের গল্প

এ বইয়ে উঠে এসেছে ব্যক্তি মানুষের ভালোমন্দ। ক্ষয় ও উন্নতি। নৈতিকতা-অনৈতিকতার গল্প। ঘটনার আঙ্গিকে। খবরের সূত্র ধরে মন্তব্যমূলক। হৃদয়জাগানিয়া। শিক্ষণীয়।

ফিলহালে ভিনদেশী চরিত্র

সাদা সভ্যতার কালো মুখ

উপরে ফিটফাট পশ্চিমা সভ্যতা। ভেতরে ভেতরে কতটা কদাকার–ফুটে উঠেছে এই বইয়ের পাতায় পাতায়। সঙ্গে আরও কিছু প্রতিবেশী জাতির চেহারা। বিভিন্ন খবরের আয়নায়। বিশ্লেষণ ও মন্তব্যে।

মুখচেনা প্রগতির ফিলহাল

ছদ্মবেশী প্রগতিশীল

এ দেশের ইসলামবিদ্বেষী মহলের ছদ্মবেশ উন্মোচন। বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে। বিভিন্ন সংবাদের আঙ্গিকে। তীক্ষ্ণ ও সরস মন্তব্যে। বাম-সেকুলার ও বাবু-সুশীলদের মুখোশখোলা ফিলহাল। এই বইয়ের বিষয় প্রতিবাদ, পর্যবেক্ষণ ও উন্মোচন।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

কিশোর-কিশোরীদের জন্য জনপ্রিয় কিছু বই

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com
rokomari.com/rahnumaprokashoni
Phone : 16297

কিতাব ঘর
kitabghor.com
Phone:01721999112

রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড
বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

আমাদের প্রকাশিত কিতাব সমূহ

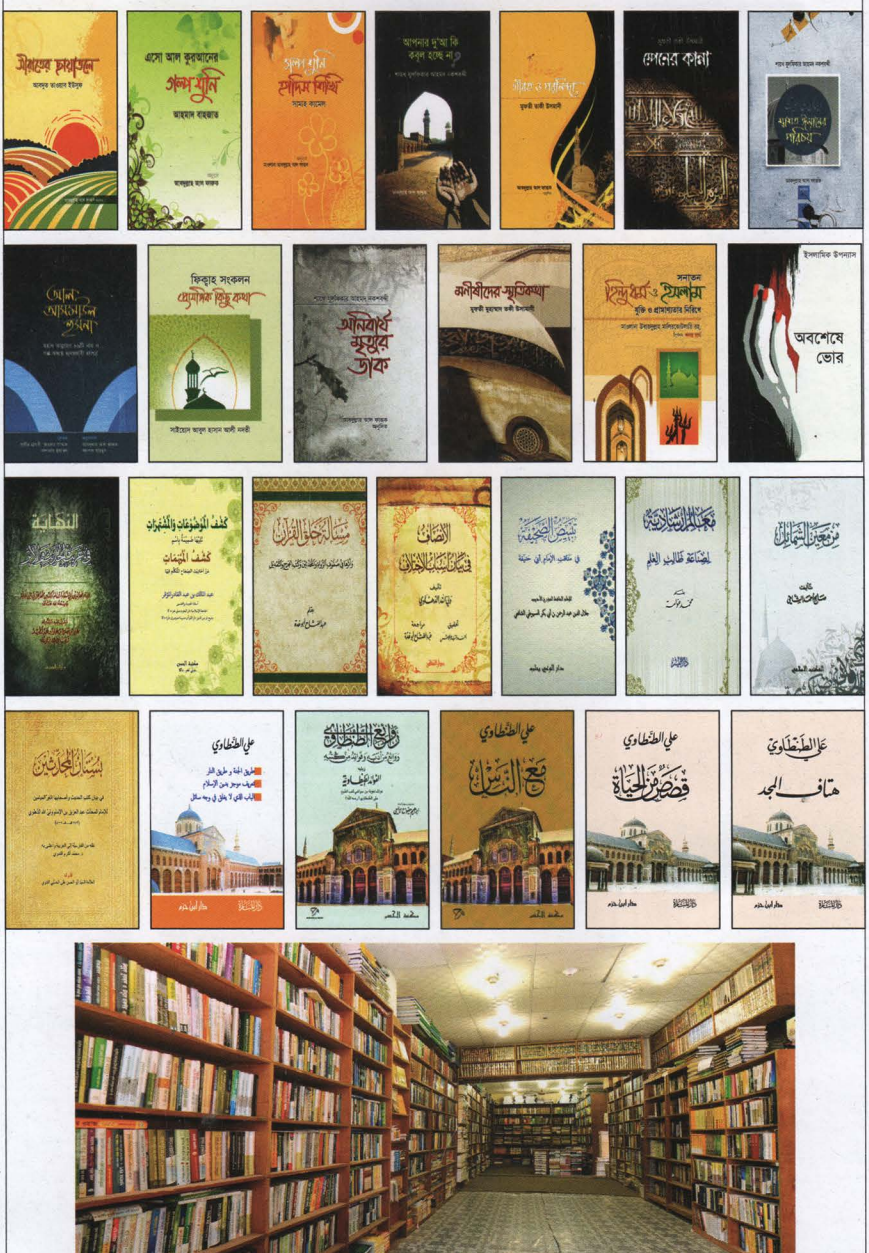

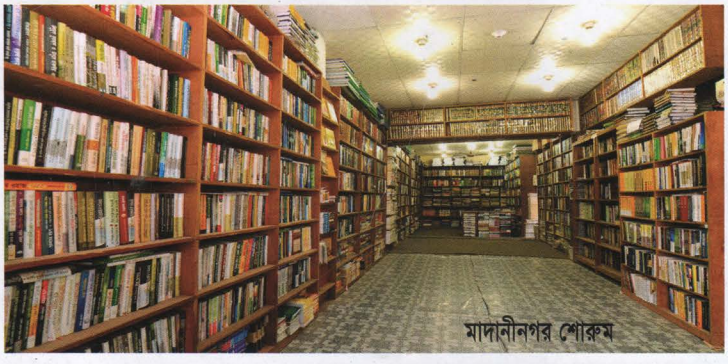

মাকতাবাতুল হাসান

০১৬৭৫৩৯৯১১৯

মাদানীনগর (মাদরাসা রোড) চিটাগাং রোড,
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় প্রতিনিধি ও সেলস ম্যান আবশ্যক, আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ০১৭৮৭০০৭০৩০

বর্তমান সংস্করণে এইচ.এম. সাঈদের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং খণ্ডের শেষে তার সূচি সংযোজন।

পৃথক এক খণ্ডে **'ফাতহুল গাফ্ফার'** মুদ্রণ এবং তার শেষে বর্তমান সংস্করণ ও এইচ.এম.সাঈদের পুরো সূচী সংযোজন।

আলোচ্য সংস্করণ থেকে ফাতহুল গাফফারের সহযোগিতায় মাসআলা বের করার পদ্ধতিসহ নির্দেশনা সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ মুকাদ্দামা সংযোজন।

৭০ গ্রাম অফসেট পেপারে উৎকৃষ্ট মুদ্রণ, বাঁধাই ও কার্টুন সহ ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত প্রতি সেটের মূল্য মাত্র ৪৫০০ টাকা। স্টক সীমিত। ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সংগ্রহ করুন।

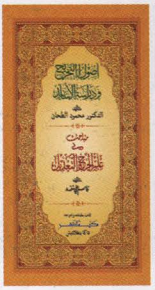

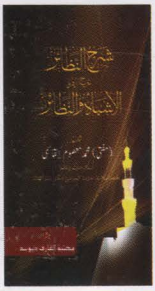

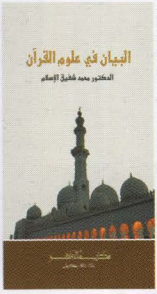

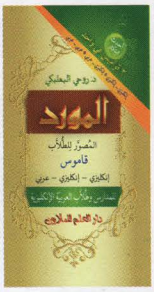

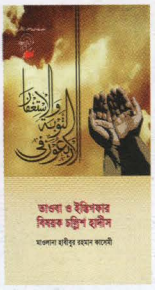

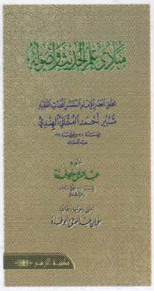

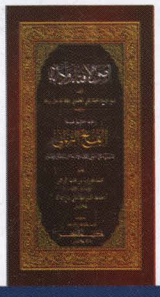

শাইখুল ইসলাম মুফতী তক্বী উসমানী দা.বা. কর্তৃক লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ **উসূলুল ইফতাহ**র ওপর মালিবাগ জামিয়ার ফতোয়া বিভাগের প্রধান মাওলানা হারুন দা.বা. কর্তৃক লিখিত অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রমাণিক আরবী শরাহ **আল ফাতহুর রব্বানী**র দ্বিতীয় সংস্করণ।

মাকতাবাহ কামেলা

একটি পিডিএফ বুক সংকলন

প্রায় ১২০০ জিবি থেকে বাছাইকৃত ২৭৫ জিবির বিশাল দুর্লভ এক ইলমী সংগ্রহ–

বাংলার ৫৬৭ টি কিতাব ৭.৫ জিবি
উরদুর ৩৫৯৫ টি কিতাব ১১৬ জিবি
আরবী ৭০০০ টি কিতাব ১২২ জিবি

বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ি শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দাম ১,০০০ টাকা মাত্র। ৩০০ জিবির হার্ডডিস্ক বা ল্যাপটপ নিয়ে আসতে হবে।

১৬ হাজার কিতাবের মাকতাবায়ে শামেলার ৩য় ভার্সন, আরবী কথপোকথনের আল আরাবিয়্যাতু বাইনা ইয়াদাইক। ৪০০ টাকায় এন্ড্রোয়েড মোবাইলের জন্যে শামেলা ভার্সন।

মাকতাবাতুল আযহার

বিক্রয়কেন্দ্র ■ বাংলাবাজার শাখা ■ যাত্রাবাড়ি শাখা

১২৮ আদর্শনগর মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
9881532 01924076365

১ আন্ডার গ্রাউন্ড ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা 01715023118

৩৪, ৩৫, ৩৬ কিতাব মার্কেট
কুতুবখালি, ঢাকা 01975023118

বাংলাদেশে আমাদেরই রয়েছে সর্ববৃহৎ আরবি প্রকাশনা। এছাড়াও মিসর, বৈরুত ও পাকিস্তানের আরবি উরদু কিতাবের সবচেয়ে বড় সম্ভার থেকে আপনার পসন্দের বইটি কিনতে চলে আসুন আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রসমূহে।